ছেঁড়া চিঠি

বিভূতি ভূষণ নন্দী

★ হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স ★

প্রথম প্রকাশ :
অগ্রহায়ণ, ১৩৬১।

প্রকাশক : মুদ্রাকর :
কমল মুখোপাধ্যায়
হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্স
৫২বি, রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯।

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা :
সুবোধ গুপ্ত

ব্লক নির্ম্মাতা :
সিটি আর্ট প্রোডাকসন।

— দুটি কথা —

বার্ণস্ এমপ্লয়িস্ ইউনিয়ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত শ্রমবার্ত্তার ১৩৫৭ সালের কার্ত্তিক সংখ্যায় ছেঁড়া চিঠির প্রথম অধ্যায় ছোট গল্প হিসাবে প্রকাশিত হয়। পরে ইহা উপন্যাস আকারে শ্রমবার্ত্তাতেই নিয়মিত ভাবে বাহির হয়। প্রকাশিত শেষের কয়েকটি অধ্যায়ে কিছু পরিবর্ত্তন করা হয়েছে এই গ্রন্থে। এই গ্রন্থ প্রকাশে আমি বহু বন্ধু বান্ধবের সাহায্য পেয়েছি। যার ঐকান্তিক আগ্রহ ও চেষ্টায় একদিন আমার "বিপ্লবী" নাটক প্রকাশিত হয়েছিল এই গ্রন্থ প্রকাশেও তার আগ্রহ প্রচেষ্টা ও সাহায্য সমভাবেই পেয়েছি। তাই বন্ধুবর সরোজ কুমার ঘোষের ঋণ অপরিশোধ্য। বন্ধুবর কমল মুখোপাধ্যায় এই গ্রন্থ প্রকাশের ভার নিয়ে আমায় চির কৃতজ্ঞতার ডোরে আবদ্ধ করেছেন। হিন্দুস্থান প্রিণ্টার্সের কর্ম্মীরা, ব্লক নির্ম্মাণ প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা করে আমার যে সব অন্যান্য বন্ধুরা নেপথ্যে ঐকান্তিক ভাবে "ছেঁড়া চিঠিকে" নিখুঁত করতে চেষ্টা করেছেন তাদের জানাই আমার আন্তরিক অভিনন্দন। সবার শেষে অভিনন্দন জানাই আমার গ্রন্থের পাঠকদের—আমার সাহিত্যের পেট্রনদের—যাদের বিচারই আমার সাহিত্য সাধনার চরম পুরস্কার বলে আমি মনে করি।

নিবেদক—

হাওড়া — বিভূতি ভূষণ নন্দী

মাকে—

মুখে যখন ছিল আধ আধ বোল তখন তুমি চলে গেছ। চার বছরের ছোট্ট শিশুর মুখে চুমো দিয়ে নিশ্চয়ই তুমি রচনা করেছিলে কতো রঙিন কল্পনা। তোমার কল্পনা মুখর হ'য়ে উঠুক আমার লেখনীর অব্যক্ত বেদনার সীমারেখা ছাপিয়ে। তোমায় স্মরণ করি।

ছেঁড়া চিঠি

সন্ধ্যা তখনও হয়নি। রোগীদের দেখে এসে কোয়ার্টারের বারান্দায় ইজিচেয়ারে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছি। ফেলে আসা দিনের কথা আজ শ্রান্ত অলস মনটাতে বড় ভীড় করছে। যৌবনের সীমা ছাড়িয়ে প্রৌঢ়ত্বের প্রায় মধ্যাহ্নে এসে পৌঁছেছি তবু আজ মনে হয় কতো কথা। ছেলেবেলার তালপুকুরের পাড়, ঘোষেদের আম-বাগান, নাগবাবুদের স্কুল, কলেজের হোষ্টেল আরো কত কি! মা, বাবা, দিদি, দাদা, বন্ধু ও আত্মীয় স্বজন জীবনের স্মৃতির পরদায় সব ভেসে আসতে থাকে; আবার মিলিয়ে যায় পরবর্ত্তী দৃশ্যের অন্তরালে। কিন্তু ওকি! ও দৃশ্য তো মেলায় না। কে, কে!

পুরান ভৃত্য রামুর ডাকে তন্দ্রা ভেঙ্গে যায়।

—বাবু আলমারির ড্রয়ারটায় একটা ছেঁড়া চিঠি পেয়েছি। দেখুন তো দরকারী কি না?

ওর হাত হ'তে চিঠিটা নিলাম। গোধূলির অন্ধকারে চিঠির অস্পষ্ট অক্ষরগুলো মনে করিয়ে দিল জীবনের এক বিস্মৃত অধ্যায়। রামু একটা টুলের উপর হ্যারিকেনের আলো দিয়ে গেল। উইয়ে ধরা ছেঁড়া চিঠির ভাষা যেন মুখর হয়ে ওঠে।

"সমরদা—

দীর্ঘ সাত বছর পরে তোমায় চিঠি লিখছি। খ্যাতি আজ তোমার দেশ জোড়া। কতো ঝাঁঝরা বুকের পাঁজরকে আজ তুমি নতুন করে দাও, কতো ঝিমিয়ে পড়া মানুষকে করো সজীব। মনে পড়ে সমর দা—যেদিন খবর এলো তুমি ভাল ভাবে ডাক্তারি পাশ করেছ। সন্ধ্যা তখনও হয়নি। তুমি এসে মাকে প্রণাম করলে; শুনতে পেলাম মা তোমায় আশীর্ব্বাদ করলো। ঠাকুর ঘরে আমি তখন সন্ধ্যাদীপ জ্বালছিলাম। তুমি ঝড়ের মতো ঘরে ঢুকে বললে - লীলা আমি পাশ করেছি। প্রদীপের শিখার মতো তুমি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছ। আমি কথা বলতে পারলুমনা আনন্দে। তুমি বললে —ভয় করছে বুঝি? এবার তো সার্টিফিকেট পেয়েছি। বললাম —তোমার ওষুধ খেলেতো। তুমি বললে—আচ্ছা দেখা যাবে। দেখি তোমার হাতটা। দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলাম। জ্বর তখন অবশ্য সামান্য ছিল। তবু অন্যদিনের মতো তোমার কাছ হ'তে পালানোর দুষ্টুমিটা ছাড়তে পারলুম না। জানতাম তো আর দিনকতক পরে তুমি কি আর এ রকম করে পালাতে দেবে। পরের স্ত্রী হযে এসব লেখাও হয়তো আজ পাপ। তবে আজ এমন অবস্থায় এসেছি কোন পাপ পুণ্যই আমায় স্পর্শ করতে সাহস করবে না। জানো সমরদা, যেদিন জানলাম আমাদের বিবাহ অসম্ভব, কারণ তোমরা বড়লোক আর আমরা গরীব সেদিন মায়ের অবস্থা তুমি নিজেই দেখেছ। ছোট বেলা হ'তে শুনে আসছি আমাদের বিয়ে হবে,

কারো অমত নেই। অর্থের আভিজাত্য সেথায় গণ্ডী দিয়ে দিল। সেদিন রাত্রে তুমি নিশ্চয়ই ক্ষমা চাইতে এসেছিলে, জানাতে এসেছিলে তোমার অক্ষমতা। তীব্র ভাষায় আমি দিয়েছিলাম তোমায় ধিক্কার—ঘর হতে বেরিয়ে যেতেও বলেছিলাম। শিক্ষা তোমার কাছেই সমরদা। নারীর বিদ্রোহীনি রূপটাই সেদিন দেখেছিলে কিন্তু ভেঙ্গে-পড়া নারীত্ব যে কতো অসহায় তার কোন নিদর্শন তোমার দেখবার সুযোগ হয়নি। সমরদা! তারপর আর একটী দিনও যদি এসে দেখতে।

তারপরের ঘটনা তো চিরন্তন। মেয়েরা চায় ঘর বাঁধতে। সেই বাঁধার নেশাতেই তো সাত বছর কাটালাম। স্বামীর সামান্য আয়ে সে ঘর স্থায়ী হলো না। তাকে আর খোকনকে খাইয়ে বেশী দিনই কিছুই থাকতো না খাবার। স্বামীকে এসব জানতে দিতাম না, তার কর্ম্মক্লান্ত দিনগুলোকে সুন্দর করতেই চেষ্টা করতাম। ছ-মাস আগে ধরা পড়লাম। স্বামীর সামনেই মুখ থেকে খানিকটা তাজা রক্ত বেরিয়ে এলো; আঁচল দিয়ে লুকোবার চেষ্টা করলাম কিন্তু স্বামী সব বুঝতে পারলে। আজ ছ'মাস ধরে চলছে চিকিৎসা। স্বামী অনেক চেষ্টা করেছে স্যানিটোরিয়ামে পাঠাবার কিন্তু দুর্ভাগা দেশে আজও তো গরীবের জন্য গড়ে ওঠেনি কোন স্যানিটোরিয়াম সমরদা। আজ রক্ত উঠেছে ভয়ানক। তুমি বলবে কেন গেলাম না তোমার কাছে? নাগো সমরদা—দেহের ক্ষয় হয়তো তুমি রোধ করতে পারতে কিন্তু মনের?

আমার কথাই শুধু এতক্ষণ বলে গেলাম। কিন্তু তোমাব ? প্রায়শ্চিত্য করতে গিয়ে নিজেকে তো নিঃশেষ করে দিলে। কেন দিলে ? জীবনের একটি অবসাদ মূহুর্ত্তও ভরে উঠবে না তোমাব কোন নারীর সংশয়াকুল মনের একটু সান্ত্বনায়। ছোট শিশুর মুখেব হাসি ভরিয়ে দেবে না তোমার শ্রান্ত দিনের একটি ক্ষণও। ভালবাসাব মর্য্যাদা দিতে তোমরা পুরুষ এমনি কবেই শুধু নিজেকে বিলিযে দাও। ঘর তোমবা বাঁধতে জানো না, সাজাতেই জানো। তোমাদেব লেখনীতে রামীর স্মৃতি অমর হযে থাকে—রক্তমাংসের রামী সার্থক হয়ে ওঠে না।

তারপর খোকন। আমরা স্বামী স্ত্রীতে তাকে ঘিবে কতো স্বপ্নই দেখতাম। এ কমাসে আমাব চিকিৎসার জন্য স্বামী সব নিঃশেষ করে দিয়েছে, থাকার ঠাঁইটুকু পর্য্যন্ত। খোকনের আর হযতো লেখা পড়াই হবে না। খোকনকে হয়তো বাধ্য হ'তে হবে কারখানাব শিশু শ্রমিক হতে, না হয় কোন বাড়ীর—আর লিখতে পারছি না সমরদা। শেষের দিনে ক্ষমা চাইছি তোমার কাছে। সমরদা একটা কথা জিজ্ঞাসা করে চিঠি শেষ করলাম—কে দায়ী এর জন্য ? নীড রচনার অধিকারও নেই আবার নষ্ট নীড়ের দীর্ঘশ্বাস ? কে দায়ী এর জন্য সমরদা ? ইতি—

লীলা

মহা জিজ্ঞাসা। এর কি নেই কোন মীমাংসা, নেই প্রতিকার ? দেখি সামনে দাঁড়িয়ে রামুর সাথে একটি দশ বারো বছরের ফুটফুটে

ছেলে। ও বলে—বাবু ছেলেটি এসেছে; এর কথাই বলছিলাম। লাইব্রেরীতে কাজ করতে পারবে। সামান্য লেখাপড়া জানে।

লীলারই স্মৃতিতে গড়া এই হোম লাইব্রেরী। বই পড়তে ভয়ানক ভালবাসতো লীলা।

বললাম -- তোমার নাম কি খোকা ?

—ডাক নাম খোকন। ভাল নাম নিখিল চৌধুরী।

—খোকন! তোমার বাবার নাম কি খগেন চৌধুরী ? বাড়ী রামনগর ? তোমার মায়ের নাম লীলা—

অবাক ছেলেটি শুধু ঘাড় নাড়ে। লীলার স্মৃতি তখনও আমার হাতে। তার স্মৃতি কি রূপ নিয়ে উত্তর নিতে এসেছে আমার কাছে তার মহাজিজ্ঞাসার ? খোকনকে বুকে জড়িয়ে ধরলাম। বিদ্রোহী মন আজ মীমাংসা চায়—

২

লীলার শেষ স্মৃতি খোকন। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম তাকে মানুষ করবো মনের মতো করে। যে প্রশ্ন করে লীলা সেদিন তার চিঠি শেষ করে ছিল আবার তা ভুলে গেলাম এক নূতন নেশায়। লীলাকে ব্যর্থ করেছি কিন্তু তার সৃষ্টিকে করে তুলবো সার্থক। খোকনের কাছ্ হ'তে একে একে সব জেনে নিলাম। লীলার মৃত্যুর পর তার বাবা আবার বিয়ে করেছেন। প্রথমটা দুঃখ হলো, লীলার মতো মেয়েকে ভালবেসেও খগেনবাবু তার স্মৃতির অবমাননা করলেন। কিন্তু আমাদের দেশে বিয়েটাই তো ভালবাসা নয় আর ভালবাসাও নয় বিয়ে।

এক রবিবার খোকনকে নিয়ে রামনগর গেলাম। বেশ ভাল লাগলো খগেনবাবুকে; কেরাণী জীবনের অনেক সুখ দুঃখের কথা বললেন। আলাপ করতে চেষ্টা করলাম খোকনের নতুনমা মঞ্জুদেবীর সঙ্গে।

বললাম— আমায় লজ্জা করবেন না। আপনি আমার বোনের মতো।

মঞ্জুদেবী সহাস্যে বললেন—লজ্জা আপনাকে করবো না বড়দা। তবে একটা অনুযোগ আপনার কাছে, ওর ব্যবহারে আমরা বড়ো অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিলাম। খোকন সেই জন্য বাড়ী ছেড়ে যেতে বাধ্য হয়; যাক সে ভাল আশ্রয়ই পেয়েছে। কিন্তু আমি আর পারছি না।

একজন অনাত্মীয়কে প্রথম দিনেই দাদার আসনে বসিয়ে তার কাছে স্বামীর দুর্ব্ব্যবহারের নালিশ জানানো যায় কিনা এ সাংসারিক বিচারের ক্ষমতা আমার নেই। তবে মঞ্জুকে আমার ভালই লাগলো, ভাল লাগলো তার অকপটতা।

বললাম—দেখুন অভাবের সংসারে ওটা প্রায়ই ঘটে থাকে। আর্থিক চিন্তায় মানুষকে করে দেয় পাগল।

খগেনবাবুও সুযোগ পেলেন। বললেন—জানেন, আমার প্রথম স্ত্রী তো আপনাদেরই আত্মীয়। সহগুণ তার ছিল অপরিমেয়। সত্যই সে ভদ্র বংশের।

লীলার প্রশংসার ভিতর দিয়ে খগেনবাবুর ইঙ্গিত মঞ্জুকে কতটা আহত করলো সেটা বোঝবার আগেই সে কোন কথা না বলে ঘরের মধ্যে চলে গেল।

বললাম—সবার সহ্য করার ক্ষমতা তো সমান নয় খগেনবাবু। খোকন তৈরী হয়ে নাও, আর দেরী করবো না।

খোকন গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল। খগেনবাবু বললেন—জানেন এ স্ত্রী আমার ভয়ানক মুখরা। অভাবের সংসারে মানিয়ে চলতে

জানে না। কি করবো লোকে খারাপ বলবে না হলে দিতাম দূর করে।

—এ সব কি বলছেন! ছি ছি!

মঞ্জু ও খোকন গৃহাভ্যন্তর হ'তে এসে দাঁড়াল। মঞ্জু দাঁড়িয়েছে খোকনের কাঁধের উপর হাত রেখে। মঞ্জু আর খোকন মনে হলো লীলা আর খোকন। মঞ্জু লীলার মতোই সৌন্দর্য্যময়ী; মাথায় সিঁদুর না থাকলে মনে হতো সে তো সেদিনেরই কুমারী লীলা, চঞ্চলা মুখরা।

মঞ্জু বলে—বড়দা যেয়ে খবর দেবেন; আর মাঝে মাঝে আসবেন আমাদের বাড়ী। খোকন তোমার মামাবাবুকে সঙ্গে করে নিয়ে এসো মাঝে মাঝে।

খোকনকে নিয়ে বাঁধান দাওয়া হ'তে নেমে এলাম প্রাঙ্গনে। মঞ্জু বললে—দাঁড়ান দাদা প্রণাম করি।

দাঁড়ালাম। মঞ্জু এসে প্রণাম করলো।

বললাম—তোমার বড়দা আশীর্ব্বাদ করতে পারলো না মঞ্জু। আশীর্ব্বাদ করার মতো সাহস ও সঞ্চয় তার নেই। শুধু সুখী হও এই কামনাই সে করবে।

রোগী দেখে এসে বারান্দায় ইজিচেয়ারে বিশ্রাম করছি। অপরাহ্নের রক্তিমসূর্য্য বিদায় বেলার ক্ষণ মুহূর্ত্তে আরও লাল হ'য়ে উঠেছে। মনে পড়ে সেদিন খগেনবাবুর বাড়ীর কথা; মঞ্জুর কথা। কেন সে লীলার মতো সহ্য করতে পারেনি? কেন সে দিতে

পারেনি তার অভাবগ্রস্ত স্বামীকে একটু সান্ত্বনা? লীলা কি ভাল বেসেছিল তার স্বামীকে, না শুধু ঘর বাঁধার নেশাতেই চেয়েছিল ঘর বাঁধতে? মঞ্জু কি তার স্বামীকে ভালবাসে? রামু একখানা চিঠি দিয়ে গেল। খামটা ছিঁড়ে দেখি মেয়েলী হাতের লেখা। কৌতুহল হলো; লেখিকার নাম দেখে পড়তে স্নুরু করলাম।

বড়দা—

সেদিন আপনাদের চলে যাবার পর আবার স্নুরু হলো নির্যাতন। অভাবের দীনতার মধ্যে যে আঘাত আসে তাকে সইবার মতো ক্ষমতা নিশ্চয়ই আপনার বোনের আছে। কিন্তু যে আঘাত মর্য্যাদাকেও ক্ষত বিক্ষত করে তাকে কেমন করে সইবো বড়দা? প্রতিকারের আশা নিয়ে লিখছি না। এতদিন মনের কথা জানাবার কেও ছিল না, ভগবান যখন বড়দা মিলিয়েছেন তখন মনটাকে একটু হালকা করতে দোষ কি? প্রায় সাত বছর আগে আমাদের বিয়ে হয়। বাবা মারা গেছেন আমি যখন ছোট ছিলাম। মা সামান্য যা জমি জায়গা ছিল তারই আয়ে আমায় মানুষ করে তুলতে চেষ্টা করেন। লেখাপড়া শেখাবার ইচ্ছা ছিল মায়ের। প্রথম বিভাগে মাইনার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলাম। কিন্তু গ্রামে আর স্নুযোগ ছিল না লেখা পড়া শেখার। বাড়ীতেই পড়াশুনা করতে থাকি। মাঝে মাঝে দেখতাম ঘটক এসে আনাগোনা করছে। কতো জায়গায় বিয়ের সম্বন্ধ হলো কিন্তু সব ভেঙে গেল শুধু টাকার জন্য। তারপর এখানে ঠিক হলো। শুনলাম যদিও দ্বিতীয় পক্ষ কিন্তু অবস্থা ভাল

আর বয়সও খুব বেশী নয়। প্রতিবাদ করলাম না, যদিও মনটা মুসড়ে গেল। বাসর ঘরে স্বামীকে ভাল করে দেখলাম বয়স প্রায় আমার তিনগুণ। শ্বশুরবাড়ী গেলাম, ফুলশয্যার রাত্রে স্বামী ঘরে ঢুকলেন মুখে তার মদের গন্ধ। বললেন—তোমাকে বিয়ে করেছি খোকনকে মানুষ করার জন্য। লীলাকে ছাড়া আর কাকেও ভালবাসতে পারি না। গুমরে উঠলো বিদ্রোহী মনটা। কিন্তু সমস্তই ভুলে গেলাম খোকনকে দেখে। খোকনের মা ডাক আমার মনের সকল ক্ষুধাকে ভুলিয়ে দিল। খোকন কাছে থাকলে সকল আঘাতই সহ্য করতে পারি। আজ প্রায় দুমাস খোকন আপনার কাছে। তাই মাঝে মাঝে জীবনের গ্লানিগুলো বড়ো হয়ে ওঠে। মাতৃস্নেহের আস্তরণে সেগুলো ঢেকে দিতে পরিনি। স্বামীর এক বন্ধু আছেন, বেশ অবস্থাপন্ন। আমাদের অভাবের সংসার তার সাহায্য না পেলে এতদিন হয়তো নিশ্চিহ্ন হ'য়ে যেত। মনে হয় তিনি তার সাহায্যের প্রতিদান আমার কাছ হ'তে আদায় করে নিতে চান। তার কাছ হ'তে আমি দুরে থাকতে চেষ্টা করি। সেদিন বাধ্য হয়ে তাকে একটু অপমান করতে হয়েছিল। বন্ধুর প্রতি দুর্ব্ব্যবহারের অভিযোগে সুরু হলো স্বামীর নির্যাতন। নির্যাতনের চিহ্নগুলো এবার এলে নিশ্চয়ই দেখতে পাবেন। যাক খোকন যেন এসব জানতে না পারে, এই অনুরোধ। আচ্ছা বড়দা উনি যদি লীলাদিকে এতই ভালবেসে ছিলেন তবে তার শূন্য আসনে আবার আমায় বসালেনই বা কেন? তাছাড়া অভাবের সংসারের জন্যও কি

ছেঁড়া চিঠি

আমি দায়ী ? ইতি—

আপনার বোন মঞ্জু।

এর কি কোন প্রতিকার নেই ? লীলার অকাল মৃত্যু, মঞ্জুও নিঃশেষ হয়ে যাচ্ছে তিলে তিলে। মনে হলো আজ সন্ধ্যার আঁধার ঘন ঘটায় ঘনিয়ে এসেছে শান্ত পৃথিবীর বুকে। স্যানিটোরিয়ামের শান্ত পরিবেশকে আশে পাশের ঝোপ জঙ্গলের বুক চিরে একঘেয়ে ঝিঁঝিঁর ডাক মুখর করে তুলেছে। পড়ার ঘরে খোকন রবিঠাকুরের কবিতা মুখস্ত করছে—

অন্যায় যে করে,
আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন
তৃণ সম দেহে।

আমিও সইবো না। লীলার স্মৃতিকে যে আপন করে নিয়েছে মাতৃস্নেহের দুর্ভেদ্য আচ্ছাদনে সে লীলার থেকেও সামান্য নয়।

৩

সেদিস ছিল রবিবার। খোকনকে নিয়ে উপস্থিত হ'লাম রামনগর। খগেনবাবুর বাড়ীর প্রাঙ্গনের মধ্য দিয়ে দাওয়ার সামনে এসে দাঁড়ালাম। খোকন দৌড়ে গেল গৃহাভ্যন্তরে। চারিদিকে কেমন যেন একটা নিস্তব্ধ ভাব। পরক্ষণেই মঞ্জু এলো। মঞ্জুর মুখে একটা আশঙ্কার ছায়া। সে দিনের হাস্যময়ী মঞ্জুকে আজকে দেখে চমকে উঠলাম। স্বামীর দেওয়া নির্যাতনের ক্ষতচিহ্ন তার কপাল হ'তে আজও মুছে যায় না। কিন্তু যে মনের ক্ষত মুখের নীরব ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছে ডাক্তারের চোখে ওটাও ধরা পড়ে।

প্রথম কথা বললে মঞ্জু—কেমন আছেন বড়দা ?

—আমি ভাল আছি। কিন্তু তোমায় তো ভাল দেখাচ্ছে না।

—না বড়দা আমি ভাল আছি।—মঞ্জুর মুখে শুষ্ক হাসি।

বললাম—ডাক্তার আবার দাদা দুটো চোখকে কি ফাঁকি দেওয়া যায়।

মঞ্জু বলে—কদিন হলো ওর বড়ো অসুখ করেছে। কাল সারারাত্রি ভুল বকেছে। আপনাকে সংবাদ দেব ভাবছিলাম।

—আরও আগে সংবাদ দেওয়া উচিত ছিল। চলো খগেন-বাবুকে দেখি।

মঞ্জুর পিছনে পিছনে খগেনবাবুর ঘরে প্রবেশ করলাম। খগেন-বাবু চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছেন খাটের উপর আর খোকন পাশে বসে মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে।

—এখন কেমন আছেন খগেনবাবু ?

খগেনবাবু ব্যস্তভাবে বললেন—আসুন আসুন ! খোকন চেয়ারটা এগিয়ে দাও তো বাবা।

খোকনকে চেয়ার আনতে নিষেধ করে শয্যাপার্শ্বে বসে পড়লাম।

খগেনবাবুকে বললাম - দেখি হাতটা ! জ্বর কদিন হচ্ছে ?

খগেনবাবু হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বললেন—আজ চার দিন হলো। রেমিশন হচ্ছে না। সর্দ্দিও বড় বেশী ; বুকে একটা বেদনা অনুভব করছি।

গাড়ী হ'তে খোকনকে ব্যাগ আন্‌তে পাঠালাম।

মঞ্জু বললে—কাল সারারাত্রি ভুল বকেছে। কিছু খেতেও পাচ্ছে না।

—কিছু ভয় নেই। বুকটা দেখে ওষুধের বন্দোবস্ত করে যাচ্ছি। কাছাকাছি কোন ডাক্তার নেই ?

খগেনবাবু বললেন—দু'তিন জন আছেন। তবে নতুন পাশ করা ডাক্তার সতীশ রায়, কাছেই বাড়ী।

—ও: সতীশ রায়। আমি চিনি।

খোকন ব্যাগ নিয়ে এলো। খগেনবাবুর বুকটা পরীক্ষা করে দেখলাম বুকে সর্দ্দি বসেছে।

মঞ্জু উৎকণ্ঠিত ভাবে বললে—কেমন দেখলেন ?

—না বিশেষ কিছু নয়। বুকে একটু সামান্য সর্দ্দি বসেছে। আমি একটা ইনজেকসন দিয়ে যাচ্ছি। খোকন তুমি একবার সতীশ বাবুকে ডেকে নিয়ে এসো। আমি চিঠি লিখে দিচ্ছি।

সতীশ ডাক্তারকে এখুনি একবার দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে একটা চিঠি লিখে খোকনকে পাঠিয়ে দিলাম।

খগেনবাবু বললেন—সতীশবাবুকে সব সময় পাওয়া যায় না। তবে আপনার চিঠি পেলে নিশ্চয়ই আসবেন।

—সতীশ কিছু দিনের জন্য আমার ছাত্র ছিল।

খগেনবাবু বললেন—বেশ ভাল ছেলে সতীশ। গরীব দুঃখীদের কাছ হ'তে কোন ফীই নেন নি।

খগেনবাবুকে একটা ইনজেকসন দিলাম। সান্ত্বনা দিয়ে বললাম—দু' একদিনের মধ্যে সেরে যাবেন। সতীশ এলে আমি আমি সব বন্দোবস্ত করে দিয়ে যাচ্ছি। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন। আমি বাইরে অপেক্ষা করছি।

খগেনবাবু ব্যস্ত হয়ে বলেন—খোকনের পড়ার ঘরটা—

—না না, আপনাদের দাওয়াটায় ভারি চমৎকার হাওয়া।

—শুনছো একটু চা টা করে দাও। এতক্ষণ এসেছেন। স্ত্রীর উদ্দেশে খগেনবাবুর অভিযোগ।

—ব্যস্ত হবার দরকার নেই খগেনবাবু। আমারও তো বোনের বাড়ী। কি বলো মঞ্জু? আপনার অসুখে মঞ্জু বড়ো চিন্তিত হ'য়ে পড়েছে!

মঞ্জু বলে—আপনি যখন এসে পড়েছেন আর চিন্তা নেই দাদা। লোকে কি বলে জানেন?

—কি বলে?

—সমর ডাক্তার শুধু দেখলেই অসুখ সেরে যায় আর ওষুধ খেতে হয় না।—মঞ্জুর মুখে হাসির তরঙ্গ।

বললাম—তা বোধ হয় সত্যি। নইলে মঞ্জুদেবীর মুখে হাসি ফোটে।

মঞ্জু বলে—আসুন বড়দা দাওয়ায় আপনার বসবার জায়গা করে দিই।

চঞ্চলা মঞ্জু চলে যায় ঘর হ'তে। ব্যাগটা হাতে নিয়ে চলে আসছি খগেনবাবু বলেন—ডাক্তারবাবু।

খগেনবাবুর শয্যাপার্শ্বে আবার ফিরে যাই।

খগেনবাবু বললেন—ওর শরীরটাও বড় খারাপ যাচ্ছে। ওকেও একটু দেখবেন। অভাবের সংসারে মাথার ঠিক থাকে না বড় দুর্ব্যবহার করে ফেলি ওর উপর।

খগেনবাবুকে সান্ত্বনা দিয়ে বলি—ও সব চিন্তা ঠাঁই দেবেন না। মঞ্জু লীলার চেয়েও কোন অংশে কম নয়; সে বোধ হয় তার চেয়েও বড়। আপনি একটু ঘুমোবার চেষ্টা করুন।

দাওয়ায় এসে দেখি একটা মাদুর বিছানো ; মাদুরের উপর আবার একটি তাকিয়া। তাকিয়া ঠেস দিয়ে শ্রান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিলাম। চৈত্রের অপরাহ্ন ; মৃদু দখিন হাওয়ার পরশে শরীর ও মনটা বেশ সতেজ হ'য়ে উঠলো। প্রাঙ্গনের এক পাশে কতগুলো করবী ফুলের গাছ। শীতের করুণ রুক্ষতাকে মুছে দিয়ে তাদের বুকে আবার ভরা যৌবনের ইঙ্গিত। শুকনো ঝরা পাতা গুলো এখনও তাদের আশে পাশে পড়ে রয়েছে অনাদৃত। তাদের দিকে কেও তাকাবে না। পৃথিবী নতুন আর নতুনেরই তো পৃথিবী।

মঞ্জু এক গ্লাস জল আর রেকাবী ক'রে শশা, পেঁপে আর নারিকেল নাড়ু নিয়ে এলো।

বললাম—বাঃ ভারি চমৎকার সব খাবার নিয়ে এলে।

মঞ্জু কুণ্ঠিত হ'য়ে বলে—গরীব বোনের বাড়ী এ তো খুব সামান্য বড়দা।

হেসে বললাম—এই তোমার সামান্য ! শশা, পেঁপে, নারিকেল নাড়ু এর মধ্যে কতো খাদ্যপ্রান—

মঞ্জু ধমক দিয়ে বলে—থাক বড়দা আর ডাক্তারি বিদ্যা শেখাতে হবে না। খেয়ে ফেলুনতো চা নিয়ে আসি।

খেতে আরম্ভ করে দিলাম। মঞ্জু চা নিয়ে এলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললাম—সত্যি বোন দাদাকে যে রকম যত্ন আরম্ভ করেছ, দাদার লোভ বড় বেড়ে যাচ্ছে। হয়তো সে প্রতিদিনই এসে হাজির হ'য়ে পড়বে।

মঞ্জু বলে—সে তো আমাদের সৌভাগ্য বড়দা।

একটু থেমে পুনঃরায় জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দাদা এরকম যত্ন কোনদিন কেউ আপনাকে করেনি ?

চমকে উঠলাম। এ প্রশ্নের উত্তর দেওয়া সত্যিই বড় কঠিন। কিন্তু মঞ্জু জিজ্ঞাসু দৃষ্টি নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

খানিক থেমে বললাম—বহুদিন আগে পেয়েছিলাম এ রকম যত্নের ছোঁয়াচ। কিন্তু সে বহুদিন, ঝাপসা হয়ে এসেছে দিদি।

মঞ্জু আবার জিজ্ঞাসা করে—আচ্ছা দাদা আপনি বিয়ে করেন নি কেন ?

আবার অদ্ভুত প্রশ্ন।

বললাম—এ কেনর উত্তর আজ দেব না। তবে আমার লুকোবার মতো কথা তোমার কাছে কিছু নেই মঞ্জু। তুমি বলবে বিয়ে করলে সেবা যত্ন আদর কিছুরই অভাব হতো না, এই তো ? কিন্তু এখনই আমার অভাব কি বলতো বোন ? জীবনের শেষের দিনে যদি তোমাদের কাছে আসি নিশ্চয়ই দাদাকে সেদিন ফিরিয়ে দেবে না।

আলোচনার ছেদ পড়ে, প্রাঙ্গণের মধ্যে খোকন ও সতীশ।

সতীশ বলে—আপনাকে এখানে দেখা পাব এ ধারনাই হয়নি।

বললাম—এ যে আমার বোনের বাড়ী। মঞ্জু সতীশ আমার ছাত্র লজ্জা কোরো না ওকে। এস সতীশ বসো।

মঞ্জু বলে—আমি আপনাদের চা নিয়ে আসি।

—না না আমি আর খাব না। সতীশের জন্য নিয়ে এসো শুধু।

মঞ্জু ও খোকন গৃহাভ্যন্তরে চলে যায়। খগেনবাবুর অসুখের কথা সতীশকে সব বললাম এবং ইন্‌জেকসন ও ওষুধের নির্দ্দেশ দিলাম। মঞ্জু সতীশকে চা এনে দিল। মঞ্জুর কাছ হ'তে জানলাম খগেনবাবু এখন ঘুমোচ্ছেন।

সতীশকে বললাম—আচ্ছা সতীশ আর তোমায় বসিয়ে রাখবো না। রাত্রে তুমি তো আবার আসছো। একবার সময় করে যেয়ো আমার বাসায় কেমন?

—নিশ্চয়ই যাব স্যার।

সতীশ পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করতে গেল।

পাটা সরিয়ে নিয়ে বললাম—আরে একি করছো?

মঞ্জু বলে—জানেন সতীশবাবু আমি প্রণাম করলে বড়দা কিন্তু পা সরিয়ে নেন নি।

লাজুক সতীশের মুখ খোলে—আপনি ওর বোন। আমায় হয়তো উনি ছোট ভাইয়ের আসনও দেন না।

বললাম—না সতীশ তোমায় ভাই আর বন্ধুরূপে জীবনের এক সঙ্কট মূহুর্ত্তে পেয়েছিলাম। সতীশের গল্প তোমায় একদিন বলবো মঞ্জু।

সতীশ বলে মঞ্জুকে—ঠিক রাত্রি ৮ টায় আসবো দিদি।

হেসে বললাম মঞ্জুকে—দেখলে দিদি হয়ে গেলে আজ থেকে।

সতীশ বলে—আপনার বোনকে দিদি বলার যে গৌরব আছে স্যার।

সতীশ সহাস্যে বিদায় নিল।

মঞ্জুকে বললাম—আর বেশী দেরী করবো না মঞ্জু। হাঁ তোমার কপালের ক্ষতটা এখনও যে সারে না দেখছি।

-- না দাদা ও সেরে গেছে।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি গৃহাভ্যন্তরে চলে যায়। ক্ষতটা সেরে গেছে! কপালটা এখনও তো ফুলে রয়েছে দেখলাম। হয়তো মঞ্জু ঠিকই বলেছে, মনের ক্ষতটা বোধ হয় সেরে গেছে। মঞ্জুর চিঠি পেয়ে সেদিন ভেবেছিলাম কতো অভিযোগ শুনবো খগেনবাবুর বিরুদ্ধে। কিন্তু আজ প্রথম এসেই খগেনবাবুর জন্য যে শঙ্কা দেখলাম তার মুখে তা আমার বিদ্রোহী মনটাকে যেন মুসড়ে দিল। লীলার চিঠি মনে পড়ে, লীলা লিখেছিল মেয়েরা চায় ঘর বাঁধতে। হয়তো এই বাঁধার নেশাতেই মঞ্জুর মনের ক্ষত শুকিয়ে যায়। খগেনবাবুর জীবন যুদ্ধের অবসন্ন মূহুর্ত্তগুলি সজীব করতে চেষ্টা করে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে। তুলসীতলায় প্রতিদিন সন্ধ্যা প্রদীপের শিখায় খগেনবাবুর আয়ু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সার্থক হোক এদের জীবন। মঞ্জু, খোকন এসে দাঁড়াল। প্রাঙ্গনের মধ্যে নেমে এলাম আমরা। খোকন ব্যাগ নিয়ে এগিয়ে গেল গাড়ীর দিকে। মঞ্জু প্রনাম করলে।

বললাম— খগেনবাবুর যে বন্ধুটির কথা লিখেছিলে তার খবর কি?

—মাঝে মাঝে আসে। ওর সঙ্গে দেখা করেই চলে যায়।

বললাম— কোন বিপদে পড়লে খবর দিও। আর অভাবের কথা জানাতে লজ্জা কোরো না আমায়।

মঞ্জু বলে—আপনার কাছে কিছু লজ্জা নেই বড়দা।

—তোমার শরীরটাও ভাল নেই। খগেনবাবুও বলছিলেন। তোমার উপর দুর্ব্ব্যবহারের জন্য খগেনবাবুও বড় অনুতপ্ত।

মঞ্জু কোন কথা বলে না। মনে হলো দাম্পত্য জীবনের আলোচলায় ও একটু লজ্জিত। মঞ্জুর কাছে বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। মোটরে ষ্টার্ট দিয়ে একবার ফিরে তাকালাম খগেনবাবুর বাড়ীর দিকে। মঞ্জু তখনও দাঁড়িয়ে আছে দ্বারের কাছে। গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে ওকে স্পষ্ট করে দেখা যাচ্ছিল না; কিন্তু মনের দূরবীনে এক অতীতের বিদায় বেলাকে স্পষ্ট করে দেয়। মানুষ অতীতকে একেবারে মুছে ফেলতে পারেনি, বর্ত্তমানের মাঝে তাই অতীতের ছবি আবার মুখর হ'য়ে ওঠে। নতুন পুরানকে মুছে দেয় নি·—তার সজীব তুলি দিয়ে তাকে করে মহিমাময়।

৪

খগেনবাবুর অসুখ সেরে গেছে। মঞ্জুও তারপর অসুস্থ হ'য়ে পড়েছিল। সতীশের চিকিৎসায় সে'ও খানিকটা সেরেছে। ওদের বাড়ী প্রায় দু'মাস যেতে পারিনি। সতীশ মাঝে মাঝে আসে, খবর পাই। মঞ্জুও চিঠি লিখে। স্যানিটোরিয়ম হ'তে এসে বারান্দায় ইজিচেয়ারে ক্লান্ত দেহটাকে এলিয়ে দিয়েছি। স্যানিটোরিয়মে এ মাসে কিছু বেডের সংখ্যা বেড়েছে ; কিন্তু তবুও রোগীর ঠাঁই হয় না। ক্ষুধা ও অপুষ্টি জাতির জীবনে যে ক্ষয়ের প্লাবন এনেছে শুধু গুটিকতক বেডের সংখ্যা বাড়িয়ে তা রোধ করা যায় না। ডাক্তারের বিজ্ঞানী মন ও তাই মাঝে মাঝে হতাশ হয়ে যায়। এ প্লাবন রোধ করবে কে ?

জ্যৈষ্ঠের প্রখর সূর্য্য ক্লান্ত অপরাহ্ণের ছোঁয়াচে ম্লান হয়ে পড়েছে। ধূ ধূ মাঠের তপ্ত হাওয়া আম, জাম, নারিকেল গাছের স্নিগ্ধ বুকে আশ্রয় নিয়ে কতকটা শীতল হয়েছে। স্যানিটোরিয়মের সামনে দিয়ে লাল পাথরের পথ মিলিয়ে গেছে দূরে, দূরান্তরের বুকে। মনটা আজ বড়ো এলো মেলো সকাল হ'তেই। স্যানিটোয়িয়মে এক তরুণ রোগী হাত দুটো হঠাৎ জড়িয়ে ধরে কম্পিত কণ্ঠে জানালো, ও বাঁচবে

কিনা। ওর তরুণী স্ত্রী এক বছরের ছোট শিশু আর বৃদ্ধা মা ওর উপরই নির্ভর করছে। সওদাগরী অফিসের কেরানী ও। সংসারের কঠিন সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত হয়ে আজ ক্ষয়ের পথে। সেদিন ওর মায়ের আর্ত্তনাদ আর ওর স্ত্রীর হতাশ ভরা চাহনি আজও ভুলতে পারিনি। ওর স্ত্রীর শুধু একটি কথা 'ডাক্তারবাবু' যেন অজস্র মিনতির ঝঙ্কারে ডাক্তারের বিজ্ঞোনী মনকেও আলোড়িত করে দেয়—ফিরিযে দাও ফিরিয়ে দাও আমার বাঁধা ঘরের কর্ণধারকে। কিন্তু পারবো কি? ওযে আজ ক্ষয়ের শেষ সীমায়।

আবার এক সুন্দরী তরুণী কাতর কণ্ঠে জানায়—ডাক্তারবাবু আমা'র অসুখ একেবারে সেরে যাবে তো?

জানলাম তার অসুখ তো বেশী কঠিন হয়নি নিশ্চয়ই সেরে যাবে।

কিন্তু হঠাৎ ও প্রশ্ন করে বসে—আচ্ছা ডাক্তারবাবু অসুখ সেরে গেল উনি আবার—প্রশ্নটা অসমাপ্তই থেকে যায়। সংশযাকুল নারীর মনে হয়তো একটু লজ্জার ছোঁয়াচ আসে। ওর অসমাপ্ত প্রশ্ন আমার মনের মাঝে ধাক্কা খায় সমাপ্তির আশায়। ওর স্বামীকি সত্যই ওকে ফিরিয়ে নেবে? ওকে সান্ত্বনা দিলাম। কিন্তু যে সমাজ ওদের শুধু ভোগের তৈজস পত্রের মর্যাদা দেয় সেথায় ওর ঠাঁই না হ'তেও পারে। এ রকম অনেকগুলো দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি।

রামু জানাল নীচে বসবার ঘরে এক ভদ্রলোক অপেক্ষা করছেন। এখানে নিয়ে আসতে বললাম; আজ বড়ো শ্রান্ত নীচে নামতে পারছি না। ভদ্রলোক এলেন। ওর পরিচয়ে জানলাম খগেনবাবুর অন্তরঙ্গ

বন্ধু যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী। রামনগরের পুরান জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী। ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেন্ট; দু'তিন খানা রেশনেরও দোকান আছে অবশ্য বেনামীতে। অর্থাৎ ক্ষীয়মাণ জমিদার বংশের উত্তরাধিকারী ক্ষীয়মাণ সমাজেরই কর্ণধার। তবে কণ্ট্রোলের যুগে ভদ্রলোক নিজেকে সমাজে বেশ কণ্ট্রোল করে নিয়েছেন। এর পরিচয় অবশ্য আগেও শুনেছি। বাল্যের সহপাঠী খগেনবাবুর সঙ্গে ওর বন্ধুত্ব আজও যে কত গভীর, যতীন্দ্রবিমল তা বেশ নানা উপমা দিয়ে বর্ণনা করেন।

শেষে মঞ্জুর প্রসঙ্গে এসে বলেন—জানেন সমরবাবু, মঞ্জুদেবী আমাকে বড় ভুল বুঝেছেন। সেদিন হঠাৎ আমায় অপমান করে বসলেন।

বললাম—হয়তো ভুল বোঝার কিছু কারণও ঘটেছিল। তাছাড়া সে ভুল বোঝার দাগ তার কপাল হ'তে এখনও মুছে যায় নি যতীন্দ্র বিমল বাবু।

ভদ্রলোক লজ্জিতের ভাণ করলেন—খগেনের সব কিছুতেই বাড়াবাড়ি। না হয় একটু অন্যায়ই করেছিল।

একটু উষ্ণভাবেই বললাম—দেখুন ন্যায় অন্যায়ের প্রশ্ন অনেক সময় বড় নয়। যদি স্বামীর অন্তরঙ্গ বন্ধু জেনেও মঞ্জু আপনাকে বন্ধুত্বের বিশ্বাস না দেয়, ক্ষতি কি তাতে? রইলেন না হয় তার কাছ হ'তে দূরে।

যতীন্দ্রবিমল বলেন—মঞ্জুদেবীর কাছে বন্ধুত্বের দাবী করি না।

তবে কি জানেন খগেনের অশান্তি দেখলে মনে বড় ব্যথা লাগে।

বললাম—ওদের স্বামী স্ত্রীর অশান্তিতে ওরাই আবার শান্তি ফিরিয়ে আনবে। দরকার কি আমাদের সেখানে নজর দেওয়া।

—দরকার অনেক সময় হ'য়ে পড়ে সমরবাবু। এই দেখুন।

যতীন্দ্রবিমল পকেট হ'তে একখানা চিঠি বাহির করে আমায় দেয়। চিঠিখানা সতীশ লিখেছে মঞ্জুকে।

দিদি—

সেদিনের ঘটনা আমার মনে আলোড়ন এনেছে। আপনি ক্ষমা চেয়েছেন; দোষ কার তা আজও ঠিক করতে পারিনি। কিন্তু আত্মরক্ষারও তো প্রয়োজন আছে। আপনাদের বাড়ী যাবনা এখন। কম্পাউণ্ডার ইনজেকসন দিয়ে আসবে। ইতি—

সতীশ

যতীন্দ্রবিমল হাসতে হাসতে বললেন—দেখলেন মঞ্জুকে আপনারা যতটা ভাল মনে করেন—

বাধা দিয়ে বললাম—ভাল তাকে আপনিও মনে করেন। চিঠি-পেলেন কোথায়?

—আমার হাতে এসে পড়েছে।

—খগেনবাবুকে দেখিয়েছেন?

উত্তর এল—না।

—বুঝেছি আপনার কৌশলটা। চিঠিখানার ভয় দেখিয়ে মঞ্জুকে আপনার প্রস্তাবে সম্মত করাতে পারবেন, এই তো?

যতীন্দ্রবিমল বলেন—কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

রুক্ষস্বরে বললাম—বোঝেন আপনি সব। চিঠিখানা আমার কাছেই থাক। আপনাকে অনুরোধ মঞ্জুর কোন ক্ষতি করতে চেষ্টা করবেন না। আপনি যত প্রতিপত্তিশালীই হোন, সমর ডাক্তার জানে কেমন করে আপনাদের সায়েস্তা করতে হয়।

যতীন্দ্রবিমল কোন উত্তর দিলেন না। এরা এই রকমই। এদের সম্ভ্রমে আঘাত দিলেও প্রতিবাদ করবে না ; শুধু পরের অপকার করাতেই এদের আত্মতৃপ্তি। ভীমরুলের মতো সুযোগ পেলে এরা শুধু হুল ফোঁটাতেই জানে। বাইরেটা এদের সুন্দর কিন্তু ভেতরটা কুৎসিত, ঠিক মাকাল ফল।

স্মিত হাস্যে যতীন্দ্রবিমল বলেন—আপনি ভয়ানক রেগে গেছেন। আচ্ছা যাই এখন। চিঠিটা বেশ মনোযোগ দিয়ে পড়লেই সব বুঝতে পারবেন, নমস্কার।

যতীন্দ্রবিমল চলে গেলেন। চেয়ে রইলাম দুরের পানে। পড়ন্ত রোদ মাটি ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে তাল নারিকেল গাছের মাথায়। সারাদিনের ক্লান্ত পাখীর ঝাঁক ফিরে যাচ্ছে সন্ধ্যার বিশ্রাম ছায়ায়। চোখের সামনে মেলে ধরি সতীশের চিঠি। সংযমী সতীশ—অবিশ্বাসীনি মঞ্জু। না না তন্দ্রাচ্ছন্ন আমার মন।

রামুর ডাকে মনের তন্দ্রা কেটে যায়। সে একটা চিঠি হাতে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলে—বাবু রাত্রে খাবেন কি ?

—যা তোর খুশী। —বলে তাকে বিদায় দিয়ে খাম ছিঁড়ে

চিঠি বাহির করলাম। দেখি চিঠি মঞ্জুর, আমায় লেখা। মঞ্জু লিখেছে –

বড়দা,

অনেক দিন আসেন নি। কেন যে বোনকে ভুলে গেলেন বুঝলাম না। শরীর অনেকটা সেরেছে। তবে কদিন মনটা বড়ো ক্লান্ত। দিন কয়েক আগে এক অসতর্ক সন্ধ্যায় একটী বিস্মৃত মুহূর্ত্ত যে দুটি মানুষের জীবনের গতিকে এরূপভাবে ঘা দেবে তা কল্পনাও করতে পারিনি। মনে করেছিলাম আপনাকে জানাতে পারবো না; কিন্তু যাকে জীবনের সব চেয়ে আপন করা যায় নেই বা রাখলাম তার কাছে লজ্জার আড়াল। ঘটনাটা ছোট। সন্ধ্যার আগে সতীশবাবু এলেন ইনজেকসন দিতে। তারপর গল্পগুজবে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। সতীশবাবু দেরির অভিযোগ করে উঠানে করবী গাছের গোড়ায় এসে পড়লেন। দাঁড়াতে বলে ওর কাছে এলাম। বললাম—ট্যাবলেটটা ফুরিয়েছে। পাঠিয়ে দেব বলে হঠাৎ করবী গাছ হতে একটা ফুলের স্তবক ছিঁড়ে নিলেন সতীশবাবু। বললেন—ফুলটা গাছ হ'তে বিচ্ছিন্ন করে এর সৌন্দর্য নষ্ট করলাম।

আমি বললাম—বিচ্ছিন্ন হওয়াই তো ওর সার্থকতা। দেবতার পায়ে—। সতীশবাবু কথাটা লুফে নিয়ে বললেন—কিম্বা মেয়েদের খোপায়। আমি বলি—সত্যই তো, মেয়েদের খোঁপায় দেখেন নি কোনদিন ফুলের সৌরভ? কোন উত্তর দিলেন না সতীশবাবু; হটাৎ যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। সেদিন আকাশে চাঁদ উঠেছে

পুর্ণিমার। করবীগাছের ফাঁক দিয়ে ওর মুখের উপর পড়েছে মায়াবী চাঁদের আলো। ভারি সুন্দর লাগলো ওকে। কে জানে একটা বিস্মৃত মূহুর্ত্ত মানুষের কোটী কোটী মূহুর্ত্তকে এমন করে চঞ্চল করে দেয়! উনি বললেন—এ ফুল আপনার। পরিয়ে দিন আমায়—বলে শুধু মাথাটা ওর বুকের কাছে নুইয়ে দিলাম। ওর ভীরু হাত দুটো শুধু খোঁপাতেই পরিয়ে দিল ফুলের স্তবক, আর কোন চঞ্চলতা প্রকাশ করলো না। ত্বরিতপদে বাহির হয়ে গেল ও। মুগ্ধার মতো দাঁড়িয়ে রইলাম। জীবনের ঐ মূহুর্ত্তটাকে অভিশাপ দেব না আশীর্ব্বদ করবো? সতীশবাবু তারপর হ'তে আসেননি বাড়ীতে। কম্পাউণ্ডার এসে ইনজেকসন দিয়ে যায়। অপরাধিনী আমি। কিন্তু আপনার কাছে সকল অপরাধের ক্ষমা পাবই। ইতি—

আপনার বোন মঞ্জু।

গোধুলির আবছা আঁধার আরও স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে। চিঠির লেখা-গুলো হ'য়ে যাচ্ছে ম্লান। মনের পাতাতেও কে যেন কালি ঢেলে দেয়।

সন্ধ্যা অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। মুখহাত ধুয়ে এসে লাইব্রেরী ঘরে বসলাম। চেয়ে রইলাম লীলার বড়ো ফটোখানার দিকে। মঞ্জু আর লীলা, যে মঞ্জুকে কিছুক্ষণ আগে পর্য্যন্ত লীলার পাশে স্থান দিয়েছি, তার স্থান কি ওখানে হতে পারে না? পুরুষ আর নারী এরা কি শুধু প্রবৃত্তিরই দাস! সৌন্দর্য্যকে এরা দুর হ'তে উপভোগ করতে পারে না? ওকে অধিকারে স্পৃহা কেন মানুষের? হয়তো

এইটাই সত্যি! প্রকৃতির বিবর্ত্তনে নিঃশেষ হবার আগে ওরা সৌন্দর্য্যকে অমরত্ব দিয়ে যেতে চায় ভাবে, ভাষায় কিম্বা বাস্তবে। অমীমাংসিত চিন্তার রেশ মনের মাঝে ঘোরপাক খায়। হঠাৎ শুনতে পাই সিঁড়িতে দুপ দাপ শব্দ। একটি কঙ্কালসার নারী মূর্ত্তি ঘরের ভিতর এসে হাঁপাতে থাকে।

—একি মীরা!

মীরা বলে—হঁা সমরদা। দাঁড়াতে পারছি না।

মীরা একটা ইজিচেয়ারে বসে পড়ে।

ও বলে—তোমার চাকরকে এক গ্লাস জল দিতে বল না।

—তুমি চুপ করে বসে থাক, আমি দিচ্ছি।

মীরাকে জল দিলাম; পাখাটাও খুলে দিলাম। একটু স্থির হয়ে মীরা বলে—ভেবেছিলাম এখানে হয়তো পেঁাছুতেই পারবো না।

বাধা দিয়ে বললাম—তুমি কথা বলো না; এখনও হাঁপাচ্ছ।

মীরা বললে—আমি সুস্থ হয়েছি। তোমার জল আর হাওয়ার'ও গুণ আছে দেখছি। সমরদা আমার বুকটা দেখ না। একেবারে ঝাঁঝরা হয়ে গেছে। তোমার কাছে এলুম বাঁচবো তো?

সান্ত্বনা দিয়ে বলি—অস্থির হয়ো না।

মীরা বলে—বড় আশ্চর্য্য লাগছে না? সেদিনের হাস্যময়ী মীরা আজ শ্মশানের কঙ্কাল। সব বলবো যদি সময় পাই। তুমি আমার বুকটা দেখনা। ষ্টেথিসকোপটা কি এখানে নেই? ষ্টেথিসকোপ বসিয়ে তুমি তো মরার খবরও বলে দিতে পার। এই নাও আমার

বোতামটা খুলে দিচ্ছি। সেদিনের মতো চমকে উঠোনা ডাক্তার। আজ আর এখানে শিহরণ নেই আছে ক্ষুধার সংগ্রামে ক্ষতবিক্ষত শুধু ক্ষয়ের চিহ্ন, উঁচু উঁচু বুকের পাঁজর।

বুকের বোতাম খুলতে খুলতে অপ্রকৃতস্থা মীরা অচৈতন্য হ'য়ে পড়ে। ওর কপালে হাত দিয়ে দেখি প্রবল জ্বর।

৫

সর্ব্বহারা নারীর অশ্রুবেদনায় ভরা মীরার ইতিহাস। জীবনে সে সবই চেয়েছিল—মেয়েরা যা চায় কিন্তু কিছুই পেল না। অপমান আর অপরাধের বোঝাই সে শুধু বহন করে গেল। তার কলঙ্কের আবরণের মাঝেও যে অকলঙ্ক নারীত্ব জেগেছিল তার সম্মান দিল না কেহ; দিল না সমাজ, দিল না বন্ধু বান্ধব, দিলাম না আমি। নারীর বেহায়াপনাকে সতীত্বের মাপকাঠিতে শুধু মাপলাম, ভালবাসার কষ্টি-পাথরে তাকে পরখ করে নিলাম না। ভাষায় আর বর্ণনায় পুরুষ নারীর রূপ দিল দেবীর; কিন্তু বাস্তব মনের সংশয়ে নারী রইলো প্রতি মূহুর্ত্তে কুলটা হয়ে। টাকার দুনিয়ায় রূপ আর রুপেয়ার হলো এক দাম।

মীরার সাথে সেদিনের প্রথম পরিচয় যদিও অবিস্মরণীয় নয় তবুও তরঙ্গের মতো ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হ'য়ে শান্ত নদীর বুকে তা আজও মিশে যায় নি। মীরা ছিল প্রফেসারের মেয়ে। এনাটমির প্রফেসার সুধীররঞ্জনকে ভালবাসতো না এমন ছাত্র বা প্রফেসার সে যুগে খুব কমই ছিল। ছাত্রজীবনে তাঁর সংস্পর্শে এসেছি; তারপর

হাউস সার্জ্জন হ'য়ে যখন তাঁর আরও ঘনিষ্টতর হলাম, দেখলাম এমন আত্মভোলা মানুষ বোধহয় পৃথিবীতে খুবই কম। একদিন তিনি তাঁর বাড়ীতে আমায় নিমন্ত্রণ করলেন। বন্ধুরা বাধা দিল, বললে— প্রফেসারের বাড়ীতে ভূত আছে। যার ঘাড়ে চাপবে তার শেষ। আশ্চর্য্য হ'তে বন্ধুরা ব্যাখ্যা করে দিল—প্রফেসারের মেয়ে শিক্ষিতা, সুন্দরী। তাতে কি ? তার চোখে নাকি মায়া আছে যার উপর নজর দেন তার সমস্ত জীবনটাই নষ্ট হ'য়ে যায়। বন্ধুরা ডাঃ সেনের গল্প বললো। ডাঃ সেন ছিল সুধীররঞ্জনের প্রিয় ছাত্র। ছাত্রাবস্থা হ'তেই নাকি কানাঘুসা চলছিল মীরার সাথে তার বিয়ে হবে। এম, বি, পাশ করার পর একদিন মীরাদের বাড়ী হ'তে রাত্রে ফিরে ডাঃ সেন আত্মহত্যা করলো।

কৌতুহল আরো বেড়ে গেল—দেখতে হবে মীরাকে। মীরার সাথে হলো প্রথম সাক্ষাৎ। সুন্দরী তন্বী মীরা। চোখ দুটো উজ্জ্বল কিন্তু শান্ত। মায়াবিনীর কুটিল দৃষ্টি তো দেখলাম না সেথা। শান্ত, সহাস্যে অভ্যর্থনা জানাল মীরা। এমনি করেই ওর সঙ্গে পরিচয় হলো নীবিড়তর। অবসর সময়ে রোজই যেতাম, নানা গল্প হতো। বন্ধুরা বলে আমি নাকি ফাঁদে পড়েছি ; কিন্তু আমি তো জানি মনের অলিগলি সবই বন্ধ করে দিয়েছে লীলা, সেথায় আর কারো প্রবেশের সুযোগ নেই। সে কথা মীরাকেও বলেছি গল্পচ্ছলে। মীরা এজন্য মাঝে মাঝে আমায় ঠাট্টা করতো লীলাময় বলে। কথা প্রসঙ্গে একদিন ডাঃ সেনের কথাও তুলেছিলাম, ও বলেছিলো পরে বলবো।

সেদিন ছিল রবিবার ; বর্ষামুখর অপরাহ্ণ। এলাম ওদের বাড়ীতে। মীরার বাবা আর ওর ছোট ভাই সেদিন এক আত্মীয়ের বাড়ী গেছেন নিমন্ত্রণে, ফিরতে রাত্রি হবে। গল্প গুজবে অনেকটা রাত্রি হয়ে গেল। মীরাকে আজ বড় এলো মেলো দেখছি। পিয়ানো বাজিয়ে গান গাইলো মীরা—ওগো বর্ষামুখর রাত্রি! গানের মাঝে খোলা বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। বাতাস আর বৃষ্টির দাপটে গাছের পাতাগুলো আন্দোলিত হচ্ছে। মাঝে মাঝে সোঁ সোঁ করে বইছে ঝোড়ো হাওয়া। লীলার কথা মনে এলো। সেও হয়তো আমার কথা ভাবছে এখন। বড় আনমোনা হ'য়ে পড়েছি, হঠাৎ একটা অস্বাভাবিক চীৎকার—সমরদা ও সমরদা।

—কি হলো মীরা ?

মীরা হেসে উঠলো। সে হাসি তো স্বাভাবিব নয়! ইজি-চেয়ারে নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে মীরা। তার চোখে মুখে প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ইসারায় যেন একটা কুৎসিৎ ইঙ্গিত।

বললাম—একি মীরা ছিঃ!

মীরা জড়িত কণ্ঠে বলে—বর্ষামুখর রাত্রি সার্থক করো তুমি বন্ধু।

না না সে কি! কোন কামনা নিয়ে তো মিশিনা ওর সঙ্গে।

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম—চললাম মীরা দেবী। জানতাম না এত কুৎসিৎ তুমি!

মীরা হেসে বললে—কেন সমরদা, যৌবনের ক্ষুধা মেটানো কি অন্যায় ?

দৃঢ় কণ্ঠে বললাম—ন্যায় কি অন্যায় সে নিয়ে তর্ক করার আমার অবসর নেই মীরা দেবী। তবে প্রলোভন দেখিয়ে ক্ষুধার আহার্য্য সংগ্রহ করা আমি অন্যায় বলেই মনে করি। আজ আমাদের সমস্ত সম্পর্কের শেষ।

হন হন করে সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে এলাম। শুনতে পাচ্ছি মীরার ডাক—সমবদা যেয়োনা। এ বাড়ীর মাটি যেন আমার পা দুটোকে আটকে ধরেছে—না না তবু যেতে হবে। ওদের বাড়ীর সীমানা পেরিয়ে একেবারে গেটের বাইরে এসে নিঃশ্বাস ফেললাম। বৃষ্টি তখনও বেশ জোরে পড়ছে। ওদের বাড়ীর দিকে তাকালাম। মীরা বারান্দা হ'তে আমায় হাতছানি দিচ্ছে। কিন্তু তখন আমি জয়ী। এ ঘটনা বন্ধু মহলে প্রচার করে দিলাম বিজয়ীর গর্ব্বে। চারিদিকে পোষ্টার পড়ে গেল মীরার নামে। ওর দিক থেকে কিন্তু কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

তারপর প্রায় পাঁচ বছর পরে ওর সঙ্গে আমার দেখা। হাঁসপাতালে তখন আমি টি, বি, ওয়ার্ডের ইনচার্য। টি. বি ওয়ার্ডে নার্স হ'য়ে এলো মীরা। শুনেছিলাম ওর বাবা মারা গেছেন কপর্দ্দক শূন্য অবস্থায়। ওই প্রথমে কথা বললে। কাজের ফাঁকে মাঝে মাঝে ওর সঙ্গে নানা রকম আলোচনাও হতো।

একদিন রাত্রে এক মুমূর্ষু রোগীর পাশে রাত্রি কাটাতে হলো। গভীর রাত্রে রোগী একটু ঘুমাতে মীরাকে বললাম—চেম্বারে চলো একটু গল্প করা যাক।

আমার সঙ্গে মীরা এলো আমাব চেম্বারে।

নানা কথাবার্ত্তার পর মীবা হঠাৎ বললে—সমরদা লীলার স্মৃতি তুমি মুছতে পারবে না জানি। কিন্তু কেন জীবনটাকে নিঃশেষ করবে ?

—তুমি ? পুরুষ পারে নিঃসঙ্গ জীবন বইতে। কিন্তু মেয়েরা তো পারে না।

দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে মীরা বলে চলে—জানি সমরদা। একদিন কিন্তু দম্ভ ছিল মেযেরাও পারে। ডাঃ সেনকে ভালবেসেছিলাম, তথাপি নিজের জিদ বজায় রাখতে তার বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখান করলাম। ডাঃ সেন তার ভীরু ভালবাসাব মূল্য নিজেকে নিঃশেষ করে, শোধ করে গেল। তার মৃত্যুর পর জীবনের নিঃসঙ্গ মুহূর্ত্তগুলো বড় ব্যথা দিতে লাগলো। তুমি এলে। যদিও জানতাম তুমি লীলাময়, তবু তোমায় জয় করবার চেষ্টা করতে লাগলাম। কিন্তু পারলাম কৈ সমরদা ? লীলার বিবাহেব পর ভাবলাম আবাব তোমায় ডাকবো। পাছে তুমি না যাও, তাই নার্স হ'য়ে তোমার কাছে সহজ পথে এলাম। আজ প্রলোভন নেই সমরদা—আজ ঘর বাঁধার তাগিদ।

মীরা চেয়ে থাকে আমার পানে। চোখে তার মিনতির ভাষা। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালাম ; কি করবো—কিং কর্ত্তব্যবিমূঢ় আমি। লীলার স্থানে আর কারো আসন হ'তে পারে না, তবু আজ বড়ো শ্রান্ত। সুন্দরী নারীর একটু স্নেহচ্ছায়া মন্দ কি। মীরার যৌবন

জোয়ার তুকুল ছাপিয়ে যাচ্ছে—সে জোয়ারে ভেসে যেতে ইচ্ছা হয়। তার চেয়ারটার হাতলের উপর বসে ডাকলাম--মীরা।

মীরা আমার হাতটা তার বুকের উপর চেপে ধরে বললে—সমবদা দেখ এখানে কি আলোড়ন।

বাহির হ'তে কে যেন ডাকলো। কিন্তু তখন তুজনেই যেন হারিয়ে ফেলেছি নিজেদেব।

সতীশ ঘবে ঢুকে আমায় মৃত্বু ধাক্কা দিয়ে বললে—স্যার আপনার ফোন।

তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িযে বললাম—আমার ফোন? চলো যাচ্ছি।

সতীশ রুক্ষস্বরে বললো—স্যার এই সব বেহায়া মেয়েগুলোকে কেন আপনারা প্রশ্রয় দেন! এরা পারেনা এমন কাজ নেই। শেষে কিনা আপনাকেও—

বাধা দিয়ে বলি—না সতীশ, ওঁকে আমিই ডেকে এনেছি। চলো।

তুজনেই বাহির হ'য়ে গেলাম। ফোনের সংবাদ সতীশের বানানো, ও আমায় বাঁচাতে চেয়েছিল। ওকে ধন্যবাদ দিলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে তুজনে চেম্বারে ফিরে এসে দেখি একখণ্ড কাগজের উপর মীরা লিখে রেখে গেছে—মিঃ রায় আমার শরীরটা বড় অসুস্থ। কোয়ার্টারে যাচ্ছি।

নিজেকে বাঁচাবার জন্য ওখান হ'তে অন্য হাঁসপাতালে চলে গেলাম। বন্ধুদের কাছ হ'তে তারপর মীরার উশৃঙ্খল জীবনযাত্রার

অনেক কাহিনী শুনেছি। সেদিন রাত্রির ঘটনার জন্য ও ক্ষমা চেয়েছিলো আমার কাছে।

আজকে মীরাকে দেখে শিউরে উঠি। সেদিন ওর পাশে দাঁড়ালে আজ ও হয়তো নিঃশেষ হতো না। আজ মনে হয় ভুল আমি'ও করেছি। ওকে শুধু এতদিন ঘৃণা করেই এসেছি। যে মেয়েদের উশৃঙ্খল হাতে প্রলোভনের হাতছানি, সে হাত সুযোগ পেলে যে সার্থক সন্ধ্যা প্রদীপ'ও জ্বালতে পারে এ সত্য আজ আর অস্বীকারের সাহস নেই।

একদিন পরে মীরার জ্ঞান ফিরে এলো। স্যানিটোরিয়ামের এক স্পেশাল কেবিনে ওকে রাখা হয়েছে। আজ দুদিন বেশ কথা বলছে। খোকনকে ওর বড় ভাল লেগেছে।

খোকনকে ও বললে—খোকন চিনতে পারছোনা আমায়? আমি তোমার মা লীলা গো।

খোকন বিস্ময়ে চেয়ে থাকে।

মীরা হেসে বলে—বেশ মা বলতে লজ্জা হয় মাসীমা বলো, কেমন?

খোকন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। খোকন রোজ কেবিনে আসে, মীরার সঙ্গে গল্প করে। মীরা রাত্রে ঘুমের ঘোরে খোকনকে খোঁজে। হায় মৃত্যুপথ যাত্রী নারী – আজও তোমার মাতৃত্বের নেশা! হয়তো এই নেশার সার্থকতাই তোমাদের জীবনের চরম বিকাশ। যে সমাজ দিল না তোমায় মা হওয়ার অধিকার আমি তাকে ঘৃণা করি।

আরো দুদিন কাটলো। প্রতিদিনের মতো সকালে কেবিনে ওকে দেখতে গেলাম।

মীরা বললে—খোকন কৈ ?

—সতীশের সঙ্গে আসছে।

—সতীশ ঠাকুর-পো আসছে ! ভারী মজা হবে। মনে আছে তোমার রুমে—

নার্সকে বাহিরে যেতে ইঙ্গিত করতে সে চলে গেল।

মীরা বলে—সত্যি বেশ মজা হবে ; আজ কি বলে অপমান করে দেখা যাবে। তুমি আমার পাশে বোস না !

মীরার শয্যাপার্শ্বে বসলাম।

—মীরা তুমি বেশী কথা বোলো না।

মীরা বললে—বারে তুমি এসেছ কথা বলবো না। শেষে আবার রাগ করবে।

নিভবার আগে মীরা জ্বলে উঠছে ঠিক নির্ব্বাণোন্মুখ প্রদীপের মতো।

মীরা প্রশ্ন করে—আচ্ছা মঞ্জু খোকনকে খুব ভালবাসে না ?

—বাসে।

মঞ্জুদের গল্প মীরাকে বলেছি।

মীরা বলে—কি মনে হয় জানো। ভালো হ'য়ে খোকনকে আমার কাছে রেখে দেবো।

সান্ত্বনা দিয়ে বলি—ভাল হ'য়ে আমার কাছেই তুমি থাকবে।

মীরা হেসে বলে—আজ তুমি আমায় থাকতে বলছো। কিন্তু কতদিন তোমার সঙ্গিনী হবার কতো সাধনা করেছি। নিষ্ঠুর তুমি ফিরেও তাকাও না। দেখ আমিও লীলার মতো ভালবাসতে পারি।

—আমি ভুল করেছি মীরা। ক্ষমা করো।

—না না ক্ষমা নয়। আমার উশৃঙ্খল জীবনযাত্রাব কথা অনেক শুনেছ। তোমার কাছে কিছু বলতে আমার লজ্জা নেই। যা শুনেছ—তার সবটা মিথ্যে নয়। বাবার মৃত্যুর পর তাঁর দেনা শোধের আর ছোট ভাইকে লেখাপড়া শিখিয়ে মানুষ করার জন্য নিজেকে একেবারে নিঃশেষ করে দিয়েছি সমরদা। যে ভাইয়েব স্নেহে জীবনের সব অপমান ভুলেছিলাম তাকেও তো হারালাম। বিশ্বাস কোরো সমরদা মেয়েরা নিজেকে বিকিয়ে দেয় ভালবাসায়, স্বেচ্ছায় আর বিকিয়ে দেয় কঠিন জীবন সংগ্রামের করুণ মুহূর্ত্তগুলির মধ্যে একান্ত অনিচ্ছায়।

—হাঁ তাই।

খোকন ও সতীশ কেবিনের মধ্যে এলো।

মীরা বলে উঠলো—এসো সতীশ ঠাকুর-পো; অনেক দিন পরে তোমার সঙ্গে দেখা, ভাল আছ তো?

মীরা মাথায় কাপড় তুলে দিল। সতীশ কতকটা যেন আশ্চর্য্যান্বিত হলো। কিন্তু আমিতো দেখছি মীরা শেষের দিনে নারীর সার্থক জীবনের অভিনয় করছে। এইটাই হয়তো ওর পাথেয়।

সতীশ বললে – হাঁ বৌদি ভাল আছি।

—জানো ঠাকুর-পো খোকন মা বলতে আমায় লজ্জা করে। তাই মাসিমা বলে। আয় বাবা কাছে আয়।

খোকন মীরার পাশে বসে। মীরা তার শীর্ণ হাতটা দিয়ে খোকনের হাতটা টেনে নেয়।

মীরা বলে—জানো ঠাকুর-পো আজ আমি সুখী।

মীরা হঠাৎ কাসে, আর কথা বলতে পারে না। কাসি বেড়ে যায়। ওর মাথাটা পাশে নুয়ে পড়ে। সতীশ খোকনকে টেনে নেয় ওর মুখের কাছ হতে। মীরাকে ধরে ফেললাম, ওর মুখ দিয়ে রক্তের স্রোত। ও হাত দিয়ে যেন কাকে খুঁজছে সে রক্তের মধ্যে। হয়তো খোকনকে! তুজন নার্স ছুটে এল কেবিনের মধ্যে। রক্ত থামার সঙ্গে সঙ্গেই ওর শরীর অসাড় হয়ে এলো। ওকে শুইয়ে দিলাম। হতভাগিনী মীরা জীবনের সকল অপমান, সকল মায়া কাটিয়ে সার্থক জীবনের স্বপ্ন নিয়েই শুধু চলে গেল। একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম ওর দিকে। সর্ব্বহারা নারী, ঐ নতুন জগতের আগমন পথে তুমি কি দিয়ে গেলে এই রক্তের আলপনা! যে জগতে তুমি বঞ্চিত হলে কন্যার স্নেহে, স্ত্রীর প্রেমে, মাতৃত্বের সার্থকতায় তাকে নিশ্চয়ই তুমি ক্ষমা করে গেলে না!

সতীশ বললে—চলুন স্যার।

নিজেকে সংযত করতে করতে বললাম—হঁ্যা হঁ্যা চলো সতীশ, মীরার সৎকারের বন্দোবস্ত করতে হবে।

৬

গোধূলির আবছা আঁধার উজ্জ্বল হ'যে ওঠে চিতার আলোয়। মজা নদীটার পাশে একটা উঁচু জায়গায় সতীশকে ডেকে নিয়ে বসলাম। সহকর্ম্মী সুধীর ও অন্যান্য বন্ধুরা চিতার ভার নিয়ে আমাদের রেহাই দিয়েছে। দুজনে কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর মৌনতা ভঙ্গ করলাম আমি।

—সতীশ মঞ্জুদের খবর কিছু বললে না?

সতীশ ধীরে ধীরে বলে—খবর ভাল নয় স্যার।

—তা আমি জানি। যখনই দেখলাম মঞ্জু চিঠি লেখা বন্ধ করেছে, অনুমান করছিলাম মঞ্জু তার দাদাকে স্বামী স্ত্রীর দ্বন্দ্বের মধ্যে আর জড়াতে চায় না।

—দ্বন্দ্বটা চরমে উঠেছে স্যার। আজ ক'দিন হলো খগেনবাবু ঘরে ফেরেন নি। শুনলাম কলকাতায় মেসে আছেন।

—সেকি মঞ্জু তাহলে একলা আছে?

সতীশ বলে—আমি তো ওদের বাড়ী আর যাই না। আজ কম্পাউণ্ডারকে পাঠিয়ে ছিলাম। শুনলাম যতীন্দ্রবিমলের চরেরা

ওকে নানা ভাবে ভয় দেখাতে চেষ্টা করছে।

ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললাম—তোমার নিজের যাওয়া উচিত ছিল সতীশ।

—যতীন্দ্রবিমল আমাদের নামে অতি জঘন্য কুৎসা রটিয়েছে।

—আমি শুনেছি সব।

সতীশ অপরাধীর মতো সঙ্কোচের সুরে বলে—কিন্তু এক দিনের ঘটনা ছাড়া মঞ্জুদিকে কোনদিন অসম্মান করিনি স্যার।

বললাম—মঞ্জু আমায় জানিয়েছে সতীশ। তার খোঁপায় ফুল দিয়ে নারীর সৌন্দর্য্যকে তুমি পুজো করেছ কিন্তু দেহকে তো অসম্মান করনি।

—তা হলেও আমি অন্যায় করেছি।

একটু থেমে সতীশ আবার বলে—ও পথটা বড় পিছল নয় কি স্যার? পুজারীর নৈবেদ্যের উপর লোভ আসাও তো স্বাভাবিক।

—পিছল বলে তুমি পথ হাঁটা বন্ধ করবে সতীশ? না পড়েও তোমায় হাঁটতে হবে যে বন্ধু। একটা মেয়ের উপর সাতদিন ধরে অত্যাচারের চেষ্টা চলেছে আর মিথ্যা দুর্নামের ভয়ে তুমি তার প্রতিরোধে এগিয়ে যাবে না? নির্ব্বিরোধ আর বৈচিত্র্যহীনতার মধ্যে সফল জীবনের সাধনা কেমন করে হবে ভাই। তুমি তো বিজ্ঞানী; সংগ্রামই তো তোমার পথ। রাতের পর রাত প্রবল রোগ জীবাণুর সঙ্গে তোমার বিরামহীন সংগ্রাম। সমাজের দেহেও যে আজ দুষ্ট জীবাণু, তাকে নিঃশেষ করবে না তুমি?

সতীশ ধীরে ধীরে বলে—আমার ভুল হয়েছে স্যার। আমি

এখুনি রামনগর যাব।

—আমিও যাব সতীশ। নিভে এসেছে ঐ চিতার আলো। আচ্ছা বলতো মীরাদের মতো মেয়ে যারা জীবন-সংগ্রামের কাঠিন্যে ভ্যানিটি ব্যাগের ইসারায় পুরুষদের প্রলুব্ধ করে ওদের কি শুধু ঘৃণাই করবো? কিম্বা আরো নীচের দিকে চেয়ে দেখো, সন্ধ্যার আঁধারে কুখ্যাত পল্লীর দরজার ধারে জীর্ণ শীর্ণ দেহটাকে প্রসাধনের জৌলুসের আড়াল করে যারা পুরুষকে ভোলায় দেহ বিক্রয়ের জন্য, সমাজের আবর্জ্জনা বলে আজও কি তাদের কথা ভাববো না? তথাকথিত শিক্ষিত বিজ্ঞের মতো আজও কি বলে যাব মন্দ তো থাকবেই নইলে ভাল'র অস্তিত্ব রইবে কেন? থাকবে কেন জৌলুস তার! কিন্তু একটু দুষ্ট ক্ষত অবহেলায় একদিন যে সারা দেহ আক্রমণ করতে পারে। আজ করছে। সমাজের ওপর তলায় মীরাদের মত মেয়ের সংখ্যা কম নয় সতীশ। চিতার আগুন নিভে গেছে, চলো।

রাত্রি প্রায় নটায় রামনগর অভিমুখে রওনা হলাম আমরা। খোকনকে সঙ্গে নিলাম; ছেলেকে কাছে পেলে মা ভোলে দুঃখ। রাত্রির আঁধার ভেদ করে আমাদের মোটর তীব বেগে ছুটে চললো। মুখ বার করে দেখি আঁধারটা সত্যই আজ বড়ো জমাট। আঁধার আকাশে তারাগুলো কিন্তু খুব উজ্জ্বল। আলোর রাতে ওরা বড়ো ম্লান হয়ে যায়। তাই আঁধার রাত আমায় ভাল লাগে, ভাল লাগে তারার মালা। জীবনে সফল মালা যারা পেল তারা অভিনন্দন জানাক আলোর রাতকে, আমি পারলাম না। নিস্তব্ধ আঁধার রাত

অতীতের কতো কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্মরণ করিয়ে দেয় ছেলে-বেলার কতো দুষ্টামী, যৌবনে বিদেশীর বিরুদ্ধে গুপ্ত আন্দোলনের কতো প্রস্তুতি। এই নিস্তব্ধ আঁধার রাত্রির বুক ভেদ করে অনুসরণ-কারী বিদেশী পুলিশকে পিছনে ফেলে মাঠের পর মাঠ অতিক্রম করার কাহিনী। মনে পড়ে নির্জ্জন জেল কক্ষের গাঢ় অন্ধকার। আবার মনে পড়ে লীলার ভয়াতুর মনের আশঙ্কা।

অন্ধকার রাত্রে ওদের বাড়ী হ'তে ফেরবার সময় লীলা প্রায়ই বলতো—টর্চ্চটা নিয়ে আসতে পারো না, অন্ধকারে কোথাও সাপ খোপ থাকবে।

হেসে বলতাম—তোমার সাপখোপ আমায় চেনে লীলা। তা ছাড়া তুমি তো শিব পুজো করো, তোমার ঠাকুরের সঙ্গীরা আমার ক্ষতি তো করতে পারে না।

হেসে পালাত ও। নানা এলো মেলো চিন্তার মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ী মঞ্জুদের বাড়ীর সামনে এসে দাঁড়াল। সম্ভবতঃ গাড়ীর শব্দে তিন চার জন যুবক বাড়ীর বাহিরে এলো। ওদের একজনের হাতে হ্যারিকেনের আলো ও অপর সকলের হাতে লাঠি। ওদের সামনে এলাম আমরা।

সতীশ বললে—কি হয়েছে সত্যেন?

সত্যেনের কপালে রক্তের ধারা।

সত্যেন বলে—চারজন গুণ্ডা প্রকৃতির লোক খগেনবাবুর বাড়ীর প্রাচীর টপকে ভিতরে ঢুকছিল। আমরা আশে পাশেই ছিলাম।

কিন্তু কারেও ধরতে পারলাম না। একজনের মাথায় লাঠি মেরেছি। আমার মাথায় ওরা মেরেছে ডাণ্ডা।

বললাম—সত্যেনের মাথা হতে প্রচুর রক্ত পড়ছে। এখুনি ব্যাণ্ডেজ করা দরকার। সতীশ গাড়ী হ'তে ব্যাগটা নিয়ে এসে ব্যাণ্ডেজ করে দাও। তোমাদের মধ্যে দু'জন আমার সঙ্গে এসো, দুর্বৃত্তদের খুজে দেখা দরকার।

সতীশ বলে—এই অন্ধকারের মধ্যে !

—ভয় কি সতীশ গাড়ীতে আমার বন্দুক আছে।

দ্বারের কাছে মঞ্জু এসে দাঁড়িয়েছে। খোকন এতক্ষণ কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হ'য়ে পড়েছিল। দৌড়ে গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরলো। মঞ্জু কোলে তুলে নিল খোকনকে। মাতৃ হৃদয়ের আনন্দময় প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠলো মঞ্জুর মুখে শত বিপদের মধ্যেও। অস্পষ্ট আলোয় তার কিঞ্চিত আভাষ চোখে এলো।

মঞ্জু বললে-–আমার বড় ভয় করছে বড়দা, আপনার বন্দুকটা নিয়ে বাড়ীর মধ্যে আসুন না।

হেসে বললাম—ভয় তোমার বিশেষ নেই মঞ্জু তবে দাদাকে আর দুর্বৃত্তের খোঁজে যেতে দেবার ইচ্ছা নেই। দাদার জন্য ভয় করছে।

মঞ্জু ধমক দিয়ে বলে—বেশ! বেশ! ভেতরে আসুন। সত্যেন ঠাকুরপোর ব্যাণ্ডেজ বাঁধতে হবে।

সকলে ভিতরে এলাম। সতীশ সত্যেনের মাথায় ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিল। মঞ্জু চা তৈরী করে নিয়ে এলো।

সত্যেন বললে—এখন থানায় একটা ডাইরি করে রাখা দরকার।

বললাম—তাতে বিশেষ কিছু হবে না সত্যেন। দুর্বৃত্তদের যে নায়ক তাকে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছো।

সত্যেন বলে—পারছি।

— ঐ সব লোকগুলোকে আইনের বেড়াজালে ফেলা শক্ত। আইনের ফাঁকি ওরা জানে। তোমাদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিই সমাজের ওপরতলার ঐ ভদ্রবেশী দুর্বৃত্তদের সায়েস্তা করতে পারে ভাই।

— এ অতি সত্য স্যার।

ওদের মধ্যে একজন বলে—ইচ্ছে হয় যতীন্দ্রবিমলবাবুকে একবার ভাল করে শিক্ষা দিই।

বললাম—অতো অধৈর্য্য হয়ো না ভাই। নিজেদের সঙ্ঘবদ্ধ করো, অন্যায়ের বিরুদ্ধে দাঁড়াবার আরো শক্তি সংগ্রহ করো। যতীন্দ্র-বিমল তো সমাজে একটা নেই ভাই।

সত্যেন বলে—আমরা সমস্ত অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চেষ্টা করছি। আপনি যদি আমাদের সাহায্য করেন—

সত্যেনের কথার মাঝেই বললাম—নিশ্চয়ই করবো। আচ্ছা এখন তা হলে কি করা যায় মঞ্জু?

মঞ্জু বলে—এরা সব রয়েছে আমার বিশেষ কোন ভয় নেই বড়দা। রাত্রি অনেক হ'লো আপনি খোকনকে নিয়ে চলে যান।

খোকন বলে—না মা, তুমি আমাদের সঙ্গে চলো। বাবা এলে আবার এখানে চলে আসবে। তুমি চলো মা, আমার বড়ো ভয় করছে।

সত্যেন বলে—সেই ভাল কথা। বৌদি এখন আপনার ওখানে যাক। আমি কাল কোলকাতা যাচ্ছি খগেনবাবুর অফিসে। বাড়ী-ঘর এরা সব পাহারা দেবে।

অমি বললাম—তুমি কি বলো সতীশ? তুমি দেখছি কোন কথাই বলছো না।

মঞ্জু হেসে বলে—সত্যি, সতীশবাবু বড় আনমনা আজ। কতদিন পরে এলেন দিদির বাড়ী কিন্তু দিদিকে চিনতেই পারছেন না।

সতীশ বললো—দিদি ভায়ে সম্বন্ধ এতো উজ্জ্বল যে নতুন করে আর তাকে পালিশ করতে হয় না মঞ্জুদি।

বলে উঠলাম—দেখলে মঞ্জু আমার ভাইকে তুমি কোনভাবেই হারাতে পারবে না।

সতীশ বলে—মঞ্জুদি দিন কতক আপনার ওখানে যাক। খগেন-বাবু ফিরে এলে এখানে আসবেন।

—সেই ভাল কি বলো মঞ্জু?

—না বড়দা আমি এখানেই থাকি। আপনাকে আর বিব্রত করতে চাই না।

খোকন জিদ ধরে—না মা তুমি চলো মামাবাবুর সঙ্গে।

—তুমি আমার সঙ্গেই চলো মঞ্জু। তোমার দাদা দিনকতক তোমার ভার নিতে পারবে নিশ্চয়ই।

—সে আমি জানি বড়দা—এই বলে মঞ্জু খোকনকে নিয়ে গৃহাভ্যন্তরে চলে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে সে একটা ছোট সুটকেশ

নিয়ে বাইরে এলো। খোকন এলো পিছু পিছু।

মঞ্জু বলে—সত্যেন ঠাকুরপো, এই নাও ঘরের "চাবিকাটি"। এ ভারটা তোমায় দিয়ে গেলাম ঠাকুরপো।

সত্যেন মঞ্জুর কাছ হ'তে চাবিকাটি নিয়ে বললো—এসে দেখবেন আপনার ঠাকুরপো এ ঘরকে নতুন করে সাজিয়ে রেখেছে।

মঞ্জু হেসে বলে—ভারি মজার কথা যে আমার ঘর ভাঙতে চায় তার ভাইয়ের হাতেই দিয়ে গেলাম ঘর সাজাবার ভার।

আশ্চর্য্যান্বিত হ'য়ে বললাম—তার মানে ?

মঞ্জু বলে—উনি যতীন্দ্রবিমল বাবুর ভাই।

সত্যেন আরও পরিষ্কার করে বলে—আমি চৌধুরী বংশের ধ্বসে পড়া ইট পাথরেরই একটা অংশ বড়দা। একদিন প্রজার শোষণের উপর হ'য়েছিল চৌধুরী বংশের উত্থান আজ আবার কালো বাজারের কর্ণধার হ'য়ে দাদা তার মর্য্যাদা ফিরিয়ে আনতে চান; এ পথে দাদাকে সাহায্য করতে পারলাম না, তাই চৌধুরী বাড়ীর ভুয়ো আভিজাত্যের দরজা আমার জন্য বন্ধ হ'য়ে গেল। কিন্তু কোল দিল এই আমার বন্ধুরা কালো, প্রতাপ, নবীন আর এখানকার অগণিত চাষী মজুর। চলুন আপনাদের দেরী হয়ে যাচ্ছে।

যেতে যেতে বললাম—তোমার পথের সাফল্য কামনা করি ভাই। সতীশ সত্যেনের সঙ্গে তুমি সক্রিয় সহযোগিতা কোরো। ঐ আধমরা লোকগুলোকে শুধু কুইনাইন আর ষ্টেপ্‌টোমাইসিন নয়, ওদের মর্য্যাদার ইন্‌জেকসন দাও। ওরা শুধু একবার সোজা হয়ে দাঁড়াক।

সতীশ বলে—নিশ্চয়ই করবো স্যার।

মোটরের পিছনের সীটে মঞ্জু খোকনকে নিয়ে বসলো. ড্রাইভারের পাশে বসলাম আমি।

সত্যেন বলে—আমরা কেউ যাব বড়দা ?

—না কোন ভয় নেই সত্যেন। হ্যাঁ, খগেনবাবুর খবরটা আমায় জানিয়ো, কেমন ?

সত্যেন ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়। আবার ছুটে চললো গাড়ী। মা আর ছেলের অস্পষ্ট কথাগুলো মাঝে মাঝে কাণে আসতে লাগলো।

খোকন যেন বলছে—বাবা ফিরে এলেই তুমি ঘরে ফিরে এসো মা।

হায় রে ঘর! এই ঘরের নেশা সবারই। শুধু ঘর ছাড়া আমি। লীলার শেষ চিঠির কথা মনে পড়ে—ঘর তোমরা বাঁধতে জান না, শুধু সাজাতেই জানো। কিন্তু আমার জীবনে বাঁধতে চাইলো যারা ঘর, তারাও তো ব্যর্থ হলো। লীলা গেল অকালে ঝরে। তবুও সান্ত্বনা সে পেয়েছিল ঘর বাঁধার সুযোগ; খোকনকে ঘিরে সে তো কল্পনার ছবিও আঁকতে পেরেছিল। কিন্তু মীরা! পেল না ডাঃ সেনকে, পেল না আমায়। ডাঃ সেন তাকে সুযোগ দিল না বোঝার, আর আমি তার ভালবাসাকে দিলাম অমর্য্যাদা। তারপর মীরার জীবনে যারা এসেছে তারা শুধু ছিল তার দেহের ক্রেতা; মূল্যই তাদের কাছে বড়ো, বস্তু নয়। আজ আবার জীবনের সাথে জড়িয়ে পড়েছে মঞ্জু। সুন্দরী হাস্যময়ী মঞ্জু চায় হয়তো

স্বামীর একটু সোহাগ, প্রৌঢ় স্বামীর কাছে মনের আর দেহের একটু ক্ষুধার উপকরণ। কিন্তু স্বামী তার এত উদাসীন, সান্ত্বনা তো সেখানে পেলই না, পেল শুধু নির্যাতন, পেল সন্দেহ। হয়তো স্ত্রীর উপর সন্দেহ আর নির্যাতনের বেড়া দিয়ে অক্ষম স্বামীরা এমনি করেই নিজের অক্ষমতাকে ঢাকতে চায়। এলোমেলো চিন্তাগুলো মনের মাঝে ভীড় করে। গাড়ীর তীব্র বেগ যেন জীবনের স্মৃতিগুলোকে তীব্র করে দেয় মনের পাতায়।

হঠাৎ মঞ্জুর ডাক—বড়দা খোকনের কে মাসিমা আজ মারা গেছেন? কৈ আগে তো তার কথা কোনদিন শুনিনি।

মঞ্জু খোকনের কাছ হ'তে সবই জেনেছে দেখছি।

বললাম—বলার সুযোগ হয় নি মঞ্জু। সে খোকনের মা হ'তেও চেয়েছিল। কিন্তু খোকন তোমার আসনে আর কারেও বসাতে রাজী নয়। তোমার মাতৃত্ব সার্থক মঞ্জু।

মঞ্জুর কাছ হ'তে কোন উত্তর এলো না। গাড়ী তখন তীব্র বেগে ছুটে চলেছে।

৭

দ্বারে মৃদু আঘাতের শব্দে ঘুম ভেঙ্গে গেল।

বাহির হ'তে মঞ্জুর ডাক বড়দা বেলা হ'য়ে গেল।

সত্যই বড়ো বেলা হয়েছে! প্রভাত সূর্য্যের হাস্যোজ্জ্বল কিরণ ঘরের মধ্যে ঝিকমিক করছে। ঘড়িতে ঢং ঢং করে আটটা বাজতে সুরু হলো। অপরাধীর মতো দ্বার খুলে দেখি দ্বারের সামনে হাস্যময়ী মঞ্জু।

—সত্যি বড়ো ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

—উনুনে চায়ের জল ফুটছে। টোষ্টগুলো ঠাণ্ডা হ'য়ে গেল। আচ্ছা ঘুম বটে বাবা! নিন তাড়াতাড়ি হাত মুখ ধুয়ে নিন।

হন হন করে মঞ্জু চলে গেল। অন্যদিন রামু এভাবে ঘুম ভাঙালে ভয়ানক রেগে যেতাম। কিন্তু আজ যেন মঞ্জুর কাছে অপরাধী হয়েগেছি। সেই আমাকে ধমক দিয়ে চলে গেল। অপরিসীম শক্তি মেয়েদের। চিরযুগ পুরুষের হারমানারই তো ইতিহাস। তাইতো পুরুষ চিরকাল বাঁধতে চেষ্টা করে নারীকে। আদিম যুগে শুধু শক্তি দিয়ে বেঁধেছিল পুরুষ। মাথায় পরালো

দাসীর চিহ্ন রক্তের টীকা, পায়ে পরালো মল, সর্ব্বাঙ্গে এঁকে দিল বাঁধনের চিহ্ন। আজকের আধুনিক পুরুষ-সমাজ মেয়েদের করলো স্বাধীন জেনানা। হাতে তুলে দিল ভ্যানিটি ব্যাগ, বিচিত্র ধরনের বাহির আভরণের দ্বারা ঝলমল করে উঠলো নারীর রূপ। সমাজ বলে ওদের স্বাধীনতা দিলাম। কিন্তু যে পরাধীনতার ভীতিচিহ্ন ওদের হৃদয়ের মাঝে এঁকে দিয়েছে সমাজ, তা মোছবার শক্তি আজ যেন ওরা হারিয়ে ফেললো। এতদিন ছিল সংগ্রামের ইতিহাস; কোথাও নারী হারলো আবার কোথাও জিতলো। কিন্তু আজ হার মানছে নারী! পুরুষ তাকে পুতুল করে সাজালো; পুতুলের মতো তাকে গড়বে, ভাঙ্গবে, খেলবে। সত্ত্বা নেই, প্রাণ নেই, শক্তি নেই!

কিন্তু মঞ্জুর মাঝে দেখলাম যেন আদিম শক্তির বিকাশ, যুদ্ধ সে করতে জানে। যৌবনকে কৃত্তিমতা দিয়ে ঢেকে সে পুরুষকে প্রলুব্ধ করতে চায় না। যৌবনকে সে ছড়িয়ে দিয়েছে, বিকশিত করেছে নিজেকে স্বচ্ছতায়। সে ঔজ্জ্বল্যে পুরুষ ভয় পায়। তাই যতীন্দ্র-বিমল বৃথাই আনাগোনা করে, সংযমী সতীশ সে আলো সহ্য করতে পারে না আর অমিতাচারী খগেনবাবু তাকে পাশ কাটিয়ে যায়। হাত মুখ ধুয়ে এসে দেখি মঞ্জু টেবিলের উপর প্লেটে টোষ্ট, ডিমসিদ্ধ আর চা সাজিয়ে রেখেছে।

—মঞ্জু এতো কি নিয়ে এলে? দাদাকে দুদিনে গরীব করবে দেখছি।

মঞ্জু বলে—দাদাতো আমার গরীব নয়, তবু কেন যে ভাঁড়ার

শুন্য বুঝ্ছি না। অতগুলো মাইনের টাকা কোথায় অপব্যয় হয় সেই সন্ধানই করছি। হ্যাঁ, টাকা দিনতো রামুকে বাজারে পাঠাবো।

—টাকাতো আমার কাছে নেই। বাজারের টাকা রামুকে দিয়ে দিয়েছি।

—তাতে একমাস বাজার চলে না। এবার মাইনের টাকাটা আমার হাতে দেবেন।

বেশ হুকুম করে সহাস্যে চলে গেল মঞ্জু। একটা অপরিচিত পরিবেশকে মেয়েরা এত শীঘ্র সহজ করে। ভাল লাগলো মঞ্জুর শাসন। মধ্যাহ্নে খেতে বসে দেখি প্রায় সাত আট রকম ব্যঞ্জন। মঞ্জু পাখা নিয়ে বসলো খাওয়াতে।

মঞ্জু বলে—ভয় নেই বড়দা আপনাকে গরীব করবো না। নির্ভাবনায় খেয়ে নিন।

তারপর স্থুরু হলো নির্যাতন, এটা খান, ওটা খান, ফেলে রাখবেন না। সারাক্ষণ যারা থাকে যত্নের দোলায় তাদের কাছে এর হয়তো মূল্য নেই, কিন্তু আমার কাছে এর মূল্য অপরিসীম। এ নির্যাতন জীবনকে ধন্য করে। জীবনের পথের বাঁকে এ শুধু দৃষ্টিপাত নয়, এ জীবন দর্শন ; তাই ভোলারও নয়।

দিন দুই পরে অপরাহ্নে চায়ের আসরে মঞ্জু একটা অভিযোগ আনলো। সে নাকি প্রমাণ পেয়েছে আমি বহু টাকা অপব্যয় করি। প্রমান স্বরূপ নিয়ে এলো একটা বাঁধানো খাতা। সর্ব্বনাশ। খাতা খানা ভুল করে বাহিরে ফেলে রেখেছি।

মঞ্জু পড়তে সুরু করলো—শ্রীমতী বিনোদিনী দেবী পঞ্চাশ, সত্যসাধন হাজরা পঞ্চাশ, হরেন ঘোষাল পঞ্চাশ প্রভৃতি। মোট পাঁচশত পঞ্চান্ন টাকা।

ধরা পড়ে গেছি। লুকিয়ে রাখা সম্ভবও নয়।

—কি করবো মঞ্জু, ওদের বড়ো অভাব।

—কিন্তু দেশের এই চরম অভাবকে শুধু নিজেকে নিঃশেষ করে কয়েকজন লোককে অর্থ সাহায্য করলেই কি রোধ করা যাবে বড়দা?

—নিজেকে নিঃশেষ করা মানে?

—নিজের দিকে চেয়ে দেখুন। আগের থেকে শরীর আপনার অনেক খারাপ হয়েছে। শুধু ডাল ভাত খেয়ে শরীর থাকে না।

—এ দুর্ভাগ্য দেশের শতকরা আশীজন লোকেরও তা জোটে না মঞ্জু, তারা সর্ব্বহারা।

—জানি বড়দা।

জিজ্ঞাসা করি—ওদের সঙ্গে আমার তফাৎ কি বোন?

মঞ্জু বলে—সর্ব্বহারার শাসনে সবাই কি এক দামে বিকোবে বড়দা?

— উচিত তো।

—একজন চাষী আর একজন বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজন কি সমান? বৈজ্ঞানিকের চিন্তাধারা সচল রাখার জন্য যা প্রয়োজন একজন চাষীর তার প্রয়োজন হয়নাতো বড়দা।

—কিন্তু বৈজ্ঞানিকের প্রয়োজনের সঙ্গে যদি চাষীর প্রয়োজন এক

করা যায় তাহলে চাষীর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারারও তো উৎকর্ষ হবে। অবশ্য বর্ত্তমানে তা হয়তো সম্ভব নয়। কিন্তু এসব রাজনীতির পাঠ নিলে কোথা হতে, গুরু কে ?

মঞ্জু হেসে বলে—সত্যেন ঠাকুর পো। ও সব কথা থাক, আপনার এ অপব্যয় বন্ধ করতে হবে।

—অর্থাৎ কয়েকটা পরিবার অনাহারে মরবে এই তো। যাই হোক মাইনেটা তোমার হাতেই এনে দেব। মেয়েরা তো হৃদয়হীন নয়, ভরসা আছে আমার বাজেটের অপমৃত্যু হবে না।

কোয়ার্টারের সামনে মোটর থামার শব্দ হলো। রামুর সঙ্গে একটী তরুণী এলো ঘরের মধ্যে। মেয়েটি আধুনিকা, বয়স সম্ভবতঃ আঠারোর বেশী হবে না।

মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—আপনি কি ডাক্তার রায় ?

—হাঁ আমিই।

—রামনগর হ'তে সতীশবাবু কি এসেছেন এখানে ?

—সতীশ, কৈ না।

মঞ্জুর দিকে তাকিয়ে মেয়েটি জিজ্ঞাসা করে—ইনি কে ?

—আমার বোন।

—ওঃ নতুন বোন, মঞ্জুদেবী নয় !

মেয়েটির কথায় যেন একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত। সে একবার মঞ্জুর দিকে ঘৃনাভরা দৃষ্টি বুলিয়ে আমার দিকে ফিরে তাকাল।

বললাম—আপনার কথা তো বুঝতে পারছি না। তবে নতুন

পুরাণোর মাপকাটিতে তো বোনের বিচার হয় না, বোন শুধু বোন।

মেয়েটি বলে—যাক ওনিয়ে তর্ক করে লাভ নেই। সতীশবাবুর কি আসবার কথা আছে এখানে ?

—কৈ না, আসার কথা তো নেই।

—সম্ভবতঃ মঞ্জুদেবী জানেন। উনি যখন এখানে, সতীশববুরও দেখা পাওয়া উচিৎ ছিল। দুর্ভাগ্য আমার! সেই চরিত্রহীনের সঙ্গে সামনা-সামনি বোঝাপড়ার সুযোগ হ'ল না আজ।

পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত জ্বলে গেল আমার। সতীশ চরিত্রহীন! আর এই ভ্যানিটিব্যাগ ধারিণী আধুনিকা, প্রগলভার কাছে তাকে জবাবদিহি করতে হবে!

উত্তর দিল মঞ্জু, সহাস্যে—আপনি ভুল করছেন সীমাদেবী, আপনাদের মতো চরিত্রের পসরা সাজিয়ে আর একজন চরিত্রহীনের সঙ্গে বোঝাপড়া সম্ভব হয় না। ভালবেসে আত্মসমর্পন করতে হয়, নাহয় দিতে হয় আঘাত। এর কোনটারও কি আপনারা পারেন সীমা দেবী ?

সীমা রাগে কাঁপতে কাঁপতে বলে—তার মানে ?

মঞ্জু বলে—মানে অতি সহজ। সতীশবাবুর কাছে আপনার সব কথা শুনেছি। বালীগঞ্জের বড়লোক আপনারা। আপনাদের পরিবেশে সতীশবাবুকে টেনে তুলতে চেষ্টা করেন কিন্তু সতীশবাবুর কাছে নেমে আসতে পারেন না। দুর্ব্বলতা আপনাদের এইখানেই। গড়তেও জানেন না, ভাঙতেও জানেন না শুধু সাজিয়ে রাখতে জানেন।

তাই ঝড় এলে শুধু কাঁদেন সাজটা উড়ে যাবার ভয়ে।

সীমা বলে—কথার জৌলুসটা বেশ আছে দেখছি।

—কিন্তু সাজের জৌলুস নেই ভাই।

বাধা দিয়ে বললাম—যাক তর্কাতর্কি করে লাভ নেই। আপনার কিছু বলার থাকলে বলে যান, সতীশ এলে বলবো।

সীমা বলে—আপনি আমার বাবার বন্ধু। আমার বাবা ব্যারিষ্টার চন্দ্রমাধব সরকার।

বাধা দিয়ে বললাম—আরে তুমি চন্দ্রর মেয়ে। সে আমার শুধু বন্ধু নয়, সহপাঠী।

সীমা বলে—আপনি শুধু সতীশবাবুকে বলবেন মেয়েদের নিয়ে এ রকম ছিনিমিনি খেলা, এ তার গৌরব নয়। তার জন্য আমি আর মুখ দেখাতে পারছি না। আর কিছু নয়।

প্রস্থানোদ্যতা হলো সীমা।

—না না তুমি বসো। তোমার বাবার বন্ধুকে নিশ্চয়ই তুমি বিশ্বাস করবে। সতীশ—

—না না আমি কিছুই শুনবো না। আমার সময় নেই।

সীমা ত্বরিত পদে ঘর হতে বাহির হ'য়ে যায়। পুনরায় মোটরের শব্দ শোনা গেল। মঞ্জু এক দৃষ্টে তাকিয়ে আছে লীলার ফটোখানার দিকে।

—কি ভাবছো মঞ্জু ?

—ভাবছি এরা শুধু মরতেই জানে বড়দা।

—কিন্তু এই মরাতেইতো গড়ে ওঠে কাব্যের অমরত্ব।

—তা মানি। কিন্তু যারা বাঁচতে জানে তারা গড়ে অমর পৃথিবী। লীলার কথা স্মরণ করুন বড়দা; লীলাদি বাঁচতে চেয়েছিল, গড়েও ছিল। অর্থনৈতিক বৈষম্যের বাধা সে অতিক্রম করতে পারলে না; ব্যর্থ হলো তার জীবন কিন্তু তবু সে রেখে গেল চিহ্ন, তাব পরিচয় নতুন পৃথিবীর একটা সবুজ বীজ।

— একথা আমি অস্বীকার করি না মঞ্জু। কিন্তু শুধু কি অর্থ-নৈতিক বৈষম্যই সব?

—নয় কেন বড়দা? এদের জীবনের কথাই ধরুন। মস্ত ধনী চন্দ্রকান্ত বাবুর মেয়ে সীমা— এদের পরিবেশে মধ্যবিত্তের ছেলে সতীশবাবুকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু জীবন সংগ্রামের কাঠিন্যে মানুষ সতীশবাবু। সংগ্রামের কাঠিন্য হ'তে আরামের দোলায় দুলতে চাননি তিনি। সীমা আর তার আত্মীয়স্বজন তার কাছে নেমে আসতে পারে না। চারিদিকেই দ্বন্দ্ব বড়দা।

হাঁ দ্বন্দ্ব চারিদিকেই। দ্বন্দ্ব মানুষে মানুষে, জাতিতে জাতিতে, বঞ্চিতে বঞ্চনাকারীতে। পৃথিবীর মানুষগুলো আজ যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠেছে। তারা সুন্দর পৃথিবীকে সমানভাবে ভোগ করতে চায়। মিট মিটে মাটির প্রদীপ আজ উজ্জ্বল বিজলীকে দাবী জানায় তাদের স্থান অধিকার করার জন্য। তারা বলে—আমাদের রশ্মির সমষ্টিতেই তোমার ঔজ্জ্বল্য, আমাদের নিঃশেষ করেই তো তোমার রূপ। আমরা আর জ্বলতে পারছি না; আমাদের শেষটুকু মিশিয়ে নিয়ে

আরও উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠো। অট্টালিকায় আর নিজেকে লুকিয়ে রেখো না, কুঁড়েঘরের পাশেও জ্বলে ওঠো। আঁধার পৃথিবী উজ্জ্বল হ'য়ে উঠুক। অনুরোধ নয়, এ দাবী।

মঞ্জু বলে—কি ভাবছেন বড়দা?

—এলোমেলো। সীমা আজ বড়ো ঘা দিয়ে গেল মঞ্জু।

রামু এসে জানাল সত্যেনবাবু এসেছেন।

—সত্যেন? আরে নিয়ে আয় এখানে, নিয়ে আয়।

সত্যেন এলো।

মঞ্জু বলে—এসো ঠাকুরপো।

—স্বাগতম্ কমরেড।

সত্যেন মৃদু হেসে হাত দুটো শুধু জড়ো করলো। একটা চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো সত্যেন।

বললাম—বলো খবর।

সত্যেন বলে—খবর খুব ভাল নয় বড়দা।

—তার মানে?

—খগেনদাকে নিয়ে আসতে পারলাম না।

—তাতে একেবারে হতাশ হবার কারণ তো নেই সত্যেন। চেষ্টা করতে হবে। খগেনবাবু আসতে অস্বীকার করলেন?

সত্যেন বলে মঞ্জুকে—এক কাপ চা খাওয়ান না বৌদি। তাড়াতাড়ি, বড়ো শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছি।

মঞ্জু হেসে বলে—কমরেডরা শ্রান্ত হয় না ঠাকুরপো। চা আমি

এখুনি নিয়ে আসছি। তবে এটাও বুঝতে পারছি কৌশলে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আমায়।

ধরা পড়ে গেছে সত্যেন।

—না না বৌদি আমি সব বলবো আপনাকে। খগেনদা নতুন ঘর পেতেছেন রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে। ঘরের দ্বার পর্য্যন্ত গিয়েছিলাম কিন্তু ঢোকবার সাহস হয় নি। তবে গৃহকর্ত্রীকে দেখে এসেছি দূর হ'তে। তন্বী, শ্যামা, আয়তলোচনা। থিয়েটার করেন নাকি কোন এক রঙ্গমঞ্চে। হয়েছে বৌদি এবার একটু চা খাওয়ান।

—কমরেড!

—সত্যি বড়দা। প্রথমে অফিসে গিয়ে খগেনদাকে অনেক বোঝালাম। কিন্তু কোন ফল হলো না। অফিসের পর অলক্ষ্যে পিছু নেলাম। দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের বাড়ী হ'তে একটি মেয়ের সঙ্গে বাহির হ'য়ে গেল খগেনদা। পরে বাড়ীর ঝির কাছ হ'তে খবর নিলাম সব। দাদারও সেখানে যাতায়াত আছে শুনলাম। এই হলো ইতিহাস।

মঞ্জু ধীরে ধীরে উঠে গেল। মনে হলো অশান্ত মঞ্জু যেন শান্ত হয়ে গেল; ঝড়ের পুর্ব্বাভাষ নয় তো?

বললাম—সত্যেন কাল আমরা একবার খগেনবাবুর অনুপস্থিতিতে দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের বাড়ীতে যাব। মেয়েটির সঙ্গে কথা বলে দেখা যাক।

—তাতে লাভ কি?

—হয়তো হতে পারে। আজ তুমি থেকে যাও।

মঞ্জু সত্যেনের তরে চা আর খাবার নিয়ে এলো।

বললাম—মঞ্জু, সত্যেন আজ আমাদের অতিথি।

—অতিথিকে আজ উপোস করে থাকতে হবে বড়দা। রান্না হয়ে গেছে।

সত্যেন হো হো করে হেসে উঠে বলে শুধু চা চাইতে যেখানে পাওয়া যায় চায়ের সঙ্গে এতো খাবার, সেখানে অতিথি সৎকার খারাপ হবে না বৌদি। আজ মাছ না মাংস ?

—মাংস।

—হায়রে সর্ব্বহারা কমরেড আজ ভাগ্য তোমার ভালো। অনেকদিন পরে মাংসের আস্বাদ মিলবে।

মঞ্জু ও আমি হো হো করে হেসে উঠি। সত্যেন কিন্তু হাসিতে যোগ দেয় না, খাবারের প্লেটটা রুদ্ধশ্বাসে শেষ করছে তখন।

চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সত্যেন বলে—ছেলে বেলায় মা হারিয়ে ভাল হয়েছে দেখছি।

বললাম—সে আবার কি।

—হাঁ বড়দা। এই বৌদিরা মায়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। স্নেহের চেয়ে স্নেহের স্মরণ আরো মধুর, কি বলেন বৌদি ?

—সাহিত্যিক তোমরা ভাল বোঝ। বড়দা, ঠাকুরপোর লেখা পড়েছেন ?

—পড়েছি। আচ্ছা সত্যেন কমরেড তোমরা, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা এ সব তো তোমাদের ভুলতে হয় ?

—সে আবার কি কথা বড়দা! স্নেহ, প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা এসব বাদ দিয়ে ভালবাসবো কেমন করে মানুষকে। আপনি কমরেডদের তাহলে অমানুষ বলতে চান?

—অমানুষ নয় তবে তাদের অতি-মানুষের সাধনা।

—না শুধু মানুষেরই সাধনা। কমরেডরাও শুধু মানুষ অপর দশজনের মতো। তবে নিজেদের সুখ দুঃখের সাথে তারা অপরের সুখ দুঃখও মিশিয়ে নেয়। পথ চলতে চলতে কতো স্নেহ ভালবাসার ছোঁয়াচ লাগে স্মরণের খাতায় তা শুধু জমা হয়ে থাকে, পথ আটকায় না। এইটাই যা তফাৎ।

—তোমায় দেখে আমার অনেক ধারণাই পালটে যাচ্ছে কমরেড।

মঞ্জু বলে—যাই আবার ঠাকুরপোর জন্য ভাত চাপাতে হবে।

সত্যেন বলে—দেখলেন বড়দা মেয়েরা আবার বাস্তব সাহিত্যিক।

মঞ্জু হেসে চলে গেল। আকাশে বেশ মেঘ উঠেছে। অনেকক্ষণ হ'তেই একটু শান্ত গুমোট ভাব। ঝড় উঠলো এবার। অশান্ত ঝোড়ো হাওয়া ঘরের মধ্যে দাপাদাপি সুরু করে দিল। সত্যেন জানালা বন্ধ করার জন্য উঠলো, নিষেধ করলাম তাকে।

বেশ ভাল লাগছে এই ভয়ঙ্কর ঝড়ের তাণ্ডব। পৃথিবীর চারি দিকেই তো তার তাণ্ডব সুরু হয়েছে। জানালার পাশে দাঁড়িয়ে সত্যেন; ঝোড়ো হাওয়ায় তার চুলগুলো উড়ছে। বৃষ্টি-কণা তার মুখটাকে উজ্জ্বল করে দিচ্ছে।

বললাম—কমরেড, কি ভয়ানক বেগে ঝড় সুরু হলো।

কমরেড বলে—এর পরে আরো শান্ত পৃথিবী, আরো সুন্দর।

হাঁ ভুল আমারই হয়েছে। ওরা যে নতুন পৃথিবীর পূজারী। ঝড়ের ভয় তো ওদের নয়। ওরা যে দুর্যোগ রাতের পথিক। প্রভাত সূর্য্যকে ওরা দেখবে। জয় হোক ওদের!

৮

সত্যেনকে নিয়ে কলিকাতা অভিমুখে রওনা হলাম। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটে যখন পৌঁছলাম তখন প্রায় দুটো বেজে গেছে।

একটা দোতলা বাড়ীর সামনে উপস্থিত হয়ে সত্যেন বললে—এই বাড়ীটা বড়দা।

সজোরে কড়া নাড়া দিলাম আমি। ভিতর হ'তে নারী কণ্ঠের একটা অস্পষ্ট শব্দ কানে এলো। কপাট খুলতে খুলতে একটা ঝাঁঝাল গলা বলে উঠলো - সময় অসময় নেই, জ্বালালে বাবা।

কপাট খুলেই কিন্তু মেয়েটি অপ্রস্তুত হয়ে পড়লো। তাড়াতাড়ি বললো—ও আপনারা। আসুন, আসুন—ওপরে আসুন।

মেয়েটি প্রৌঢ়া ; তার বেশ-ভুষায় বাড়ীর ঝি বলেই মনে হলো। সত্যেনের দিকে তাকিয়ে দেখি সে যেন আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে উঠেছে এই অপ্রত্যাশিত আহ্বানে। আমিও কম হইনি। হয় তো এখানকার রীতিই এই। ছাত্র-জীবনে এ পাড়াটা দিয়ে ইচ্ছা করেই যেতাম না, অথচ এইখান দিয়েই ছিল মেসের সহজ পথ। এই কুখ্যাত নারী-দেহ বিক্রয়কেন্দ্র সম্বন্ধে ছাত্র-জীবনে অনেক আজগুবি গল্প শুনেছি

এবং এই কেন্দ্রকে ভয়ও করতাম মনে মনে।

—এসো সত্যেন ভেতরে এসো—বলে প্রৌঢ়ার পশ্চাতে পশ্চাতে দোতলায় উঠলাম।

প্রৌঢ়া একটি ছোট ঘরে আমাদের বসিয়ে বললো—এইখানে বসুন। দেখি দিদিমনি বোধ হয় ঘুমুচ্ছে। ঘুম ভাঙালে আবার বড়ো রাগ করে।

বললাম—দেখ তোমার দিদিমনির সঙ্গে বিশেষ দরকার আছে।

প্রৌঢ়া বলে—দিদিমনি বড় বদমেজাজি বাবু। এক এক দিন কতো বাবুকে যে ফিরিয়ে দেয় তার ঠিক নেই। লেখা-পড়া জানে, নাচ-গান জানে দেমাক ধরে না। যার জন্যে তোর ঘরে কতো বড় বড় লোক আসে—সেই যতীন্দ্রবিমল বাবুকেও এক এক দিন গালা-গালি করে তাড়িয়ে দেয়। বসুন বাবু দেখি আবার রাজকন্যার ঘুম ভাঙাতে পারি কিনা।

প্রৌঢ়া চলে গেল। ঘরখানির মাঝে একটি সুদৃশ্য টেবিলের চারিধারে খানকতক চেয়ার। দেয়ালে কতকগুলো প্রাকৃতিক দৃশ্যের ফটোগ্রাফ টাঙানো। একটি আলমারিতে বইগুলি সুন্দরভাবে সাজানো। তার মধ্যে সেক্সপীয়ার ও বার্ণার্ডশ'র দু একখানা নাটকও চোখে পড়লো। এই দেহ-বিক্রয় বিপণির মধ্যেও রুচির সঙ্গতি যে লুকিয়ে আছে তা দেখে বড়ো আশ্চর্য্য লাগলো।

সত্যেনকে বললাম—কমরেড, এখানেও সেক্সপীয়ার, বার্ণার্ডশ।

সত্যেন এতক্ষণ আলমারিটার দিকেই তাকিয়ে ছিল, চোখ ফিরিয়ে

বললে—শুনেছি গৃহকর্ত্রী শিক্ষিতা ও অভিনেত্রী। সেক্সপীয়ার বার্ণার্ডশর সাধনার স্পর্শ হয়তো এখানেও মিলতে পারে বড়দা।

—নিশ্চয়ই পারে। তবে আশ্চর্য্য লাগে গৃহকর্ত্রীর এত গুণ থাকতেও এ পথে কেন।

পাশের ঘর হ'তে প্রৌঢ়া মেয়েটির ঝাঁঝাল কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

—ওঠো গো রাজকন্যে ওঠো। বাবুরা অনেকক্ষণ বসে আছেন। লেখা-পড়া জানো এটা বোঝ না, খদ্দেরকে অযত্ন করলে দোকান চলে না।

তীব্র শ্লেষ-কণ্ঠে উত্তর শোনা গেল—জিনিষ ভাল পেলে খদ্দের তার নিজের গরজেই আসবে বাড়ীওয়ালী। এতদিন দোকান করে এটাও বোঝ না। চলো দেখি তোমার কেমন খদ্দের—মন ভোলাতে পারি কিনা।

বড় লজ্জা লাগলো সত্যেনের সামনে। তবে সত্যেন সাহিত্যিক, এ নোংরা হ'তে তার অভিজ্ঞতার সঞ্চয় আরো পুষ্ট হবে নিশ্চয়ই। আঁচল দুলিয়ে মুখে কৃত্রিম হাসির পসরা নিয়ে গৃহকর্ত্রী ঘরে ঢুকলো।

একটা চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললো—সুস্বাগতম। দেখুন বড়ো অসময়ে এসে পড়েছেন আপনারা। খবর দিয়ে এলে আপনাদের ভোলাবার জন্য একটু সাজতে পারতাম।

উত্তর দিল সত্যেন—ভোলবার জন্যে আসিনি আমরা। ইনি আমার বড়দা, বিশেষ আবশ্যকে এসেছেন আপনার কাছে।

মেয়েটি গম্ভীর হ'য়ে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে বললো—বলুন কি দরকার আমার কাছে ?

বললাম—আমরা জেনেছি খগেনবাবু এখানে থাকেন। আমরা তাকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি।

—বেশতো নিয়ে যান না। আমি তো তাকে আটকে রাখিনি। —মেয়েটি রুক্ষ স্বরে বলে।

—না আমি সে কথা বলছি না। তবে আপনার সাহায্য চাই।

মেয়েটি বলে—আপনাদের পরিচয়টা যদি বলেন তাহলে আমার বড়ো সুবিধা হয়।

—আমি ডাঃ সমর রায়, টি বি হসপিট্যালের সুপারিনটেনডেণ্ট। আর ইনি রামনগরের জমিদার যতীন্দ্রবিমল চৌধুরীর ভাই।

মেয়েটি হেসে বলে—অর্থাৎ উদীয়মান সাহিত্যিক সত্যেন চৌধুরী। দেখুন আমার শোবার ঘরে যদি আপনাদের যেতে আপত্তি না থাকে—খগেনবাবু সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। বাড়ী-ওয়ালী আশে পাশে ঘুরছে তার কানে না যাওয়াই ভালো।

উঠে বললাম চলুন।

তিনজনে ঘরটার বাহির হ'তেই দেখি প্রৌঢ়া মেয়েটি বাহিরে দাঁড়িয়ে। সে হেসে জিজ্ঞাসা করে—কি বাবুরা পছন্দ হয়েছে তো ?

আমরা নিঃশব্দে একটা হলঘরের মধ্যে এলাম। মেয়েটি সশব্দে দরজা বন্ধ করে দিল।

মেয়েটি বললে—এই বাড়ীওয়ালী অর্থাৎ এই গৃহের ও ব্যবসায়ের

মালিক। তবে আমায় ভয় করে।

হলঘরটি বিস্তৃত। মেঝের উপর দামী কার্পেট পাতা। তার উপর নানা রকম বাদ্যযন্ত্র, বড় বড় তাকিয়া, ফুলদানি প্রভৃতি। হলঘরটির মধ্য দিয়ে একটী ছোট ঘরে ঢুকলাম আমরা। ঘরটির মধ্যে একটি খাটিয়ার উপর শুভ্র বিছানা। একটী চেয়ার ও তার সামনে টেবিলের উপর খনকতক বই সাজানো। হলঘরের মধ্যে আড়ম্বরের প্রাচুর্য্য আর শোবার ঘরে তার কোন চিহ্নও চোখে পড়ে না। মনে হয় এখানকার আড়ম্বর ও কৃত্রিমতার রূপদাত্রীরা জীবনের সারল্যকে ভুলতে পারে না। রাত্রির কৃত্রিম আলোয় যে রূপযৌবন ঝলমল করে ওঠে, দিনের স্বচ্ছ আলোয় তার ফাঁকি হয়তো ব্যর্থতার হতাশায় ম্লান করে দেয়। সরল জীবন হাতছানি দেয় এদের।

মেয়েটি বলে—আপনারা বিছানার উপর বসুন ডাক্তারবাবু।

মেয়েটি চেয়ারে ব'সল আমাদের মুখোমুখি।

জিজ্ঞাসা করলাম—খগেনবাবু কোন ঘরে থাকেন?

মেয়েটি উত্তর দেয়—পাশের ঘরে। ঐ ঘরখানায় যতীন্দ্রবিমলবাবু মাঝে মাঝে এসে থাকেন। খগেনবাবুর অনেক কথাই জানি। ওকে ভুলিয়ে রাখার জন্যও টাকা পাই যতীন্দ্রবিমলবাবুর কাছ হ'তে।

—কিন্তু যতীন্দ্রবিমলের এতে স্বার্থ কি?

—স্বার্থ মঞ্জু দেবী। খগেনবাবুকে এখানে আটকে রাখলে সহজ হবে মঞ্জু দেবীকে আয়ত্তের মধ্যে আনা।

—আপনি দেখছি জানেন সব। কিন্তু সে আশাও বৃথা; মঞ্জু

এখন আমার বাসায়।

—আমায় আপনি বলছেন কেন বলুন তো? আমি রেখা। এক দিন বাঁচিয়েছিলেন, আজ কি বোন বলেও স্বীকার করবেন না।

—নিশ্চয়ই করবো। তোমায় বাঁচিযেছিলাম কবে মনে পড়ছে না তো রেখা?

রেখা বলে—সে অনেক দিনের কথা। তখন কলেজে পড়ি। মুখ দিয়ে রক্ত উঠতো, সবাই আশা ছেড়ে দিয়েছিল। কিন্তু আপনার চিকিৎসায় বেঁচে উঠি। যাকগে সে সব কথা। এখন কিভাবে আপনাদের সাহায্য করতে পারি বলুন?

—যে কোন প্রকারে খগেনবাবুকে এখান হ'তে তাড়াতে হবে। তোমার আর্থিক ক্ষতি—

রেখা কথা লুফে নিয়ে বলে—আপনি পূরণ করবেন এই তো? টাকা আজ আমার কাছে বড় নয় ডাক্তারবাবু। হয়তো এক দিন ছিল যে দিন সামান্য ক'টা টাকার জন্য জমিদারের কাছে দেহ-বিক্রয় করতে বাধ্য হয়েছিলুম। আমি যতীন্দ্রবিমল বাবুর উপর চাপ দিতে পারি তার কলঙ্কময় জীবন-কাহিনী প্রকাশের ভয় দেখিয়ে। কিন্তু মঞ্জু দেবীর তাতে বিশেষ উপকার হবে বলে মনে হয় না।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—কেন?

—খগেনবাবুকে এখানে রাখতে না পারলে রামনগরের জমিদার তার পথের কণ্টককে হয়তো জগৎ হ'তেই সরিয়ে দেবে।

বলরাম—তা কি সম্ভব!

রেখা বলে—আপনি ডাক্তার। রোগ-যন্ত্রণাকাতর অসহায় মানুষের আরোগ্যই আপনার চোখে পড়ে। কিন্তু মানুষ যে কতদূর নীচে নামতে পারে সে দৃশ্য এখানে অহরহ দেখতে পাই! তাই বিশ্বাস হারিয়েছি মানুষের উপর।

সত্যেন বলে—এই নীচের অন্ধকার হ'তে যদি বাহিরের আলোয় বেরিয়ে আসেন দেখবেন অবিশ্বাসী নয় মানুষ।

রেখার চোখে আগুন জ্বলে ওঠে।

সে বলে—নয়? এ পথে যারা আমায় নামিয়ে নিয়ে এলো তারা শিক্ষিত, সভ্য, সমাজপতি।

শান্ত সহাস্যে উত্তর দেয় সত্যেন—আপনিও তো ঐ সমাজের একজন। নীচের এই কাদামাটী গায়ে মেখে নিলেন কেন? কেন মেনে নিলেন পরাজয়?

রেখা বলে—এ অতি বাস্তব সত্যেনবাবু। বইএর ভাষায় এর উত্তর মেলে না। আপনি বলবেন পরাজয়ের চেয়ে মরাও ভাল ছিল যুদ্ধ করে। কিন্তু এই দুর্ভেদ্য সমাজ ব্যবস্থার বুকে আমার ঘা দেওয়ার মূল্য কতটুকু?

—মূল্য অনেক। আপনার ক্ষীণ আঘাতের ব্যর্থতা এক দিন হবে বলিষ্ঠ আঘাতেরই পাথেয়। আসলে সমাজের মানুষগুলোকে নীচে টেনে নিয়ে আপনি তার উপর প্রতিহিংসা নিতে চান।

—এ প্রতিহিংসা নেওয়া কি অন্যায়?

সত্যেন বলে—আমি তা বলছি না। তবে প্রতিহিংসা নেওয়ার

পথও এ নয়। নীচে হ'তে মানুষকে উপরে তোলার সাধনাই ছিল আপনার প্রতিহিংসা নেওয়ার বড় অস্ত্র। যে সমাজ-ব্যবস্থা তার জৌলুস চিরস্থায়ী করার জন্য নীচের অন্ধকারকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, আপনিই তাকে সাহায্য করছেন।

রেখা বলে—আপনার সাথে আজ একমত হতে পারলাম না সত্যেনবাবু। তবে যে দিন পারবো এ অন্ধকার হ'তে হয়তো মুক্তি পাবো সেদিন।

রেখার শেষ কথাগুলোর মধ্যে ব্যর্থতার হতাশাই ফুটে উঠলো। রেখা পুনরায় বলে—আপনি কোন কথা বলছেন না ডাক্তারবাবু? আপনি নিশ্চয়ই ভাবছেন মঞ্জুর কথা।

বললাম—তুমি ঠিকই ধরেছ রেখা। ওদের চিন্তাই আমায় বিচলিত করছে!

রেখা বলে—আমি কথা দিচ্ছি যতীন্দ্রবিমলবাবুকে আমি চাপ দেব আর খগেন বাবুকেও বোঝাবার চেষ্টা করবো।

—আমাদের ধারণা তুমি চেষ্টা করলে নিশ্চয়ই সফল হবে।

রেখা বলে—চেষ্টা আমি করবই, আপনার কাছে ঋণ তো আমার কম নয় ডাক্তারবাবু।

—নীচের এ অন্ধকার হ'তে নিজেকে মুক্ত করে সে ঋণ শোধ করতে চেষ্টা কোরো রেখা। যে দিন বোনের মতো দাদার কাছে যেয়ে দাঁড়াবে সে দিন দাদা তোমার সুখীই হবে।

রেখা শুধু বললে—চেষ্টা করবো বড়দা।

সে পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো আমায়। ধীরে ধীরে সে দরজাটা খুলে দিল। দ্বারের সামনেই দাঁড়িয়ে ছিল বাড়ীওয়ালী।

সে বললে—ওগো রেখারাণী, লাহিড়ী সাহেব তোমায় নিয়ে বেড়াতে যাবে মনে আছে তো। তৈরী হয়ে থেকো।

রেখা শান্ত ভাবেই বলে—তোমার রাজপুত্তুরকে বলে দিও আজ আমার বেড়াতে যাবার সময় হবে না। সত্যেনবাবু আপনার সাহিত্যে যেন এ পাপপুরীর আসল রূপ মুখর হয়ে ওঠে, এইটুকু রইলো শুধু আমার অনুরোধ।

রেখার চোখ দুটোয় যেন জল ভরে উঠলো। নিজেকে লুকোবার জন্যে দরজা বন্ধ করে দিল সে। বাড়ীওয়ালী আমাদের পুনরায় আসার কথা ও আজকের অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করে ব্যবসা বুদ্ধির পরিচয় দিল। হঠাৎ কানে এলো সেতারের আওয়াজ। সে আওয়াজে যেন একটা করুণ সুরের মূর্চ্ছনা ভেসে উঠলো। রেখা সেতার বাজাচ্ছে। বড রাস্তার মোড় পর্য্যন্ত সে করুণ সুরের অস্পষ্টতা মনের তন্ত্রীতে যেন ঘা দিতে লাগলো। ব্যর্থতার এই করুণ ঝঙ্কার আমার মনের মাঝে আনলো যে আলোড়ন—সে কবে বাস্তব রূপ নেবে পৃথিবীর মানুষের মাঝে! কবে এই করুণ ঝঙ্কারে—বেজে উঠবে রুদ্রের তাণ্ডব—অগ্নি মন্ত্রের ভৈরবী!

৯

প্রায় দুমাস কেটে গেছে। মঞ্জু এখনও আমার এখানে। কিছুদিন আগে রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট হ'তে রেখার একখানা চিঠি পেয়েছিলাম।

রেখা লিখেছে—বড়দা, খগেনবাবুর গৃহ প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য চেষ্টা করছি। কিন্তু পারবো কিনা ভগবানই জানেন! মঞ্জুদেবীর বিরুদ্ধে তার অভিযোগ অনেক। আপনার অকৃত্রিম সাহায্যের উপরও তার সন্দেহ। মোট কথা যতীন্দ্রবিমলের শয়তানী বুদ্ধি তার মনটাকে বিষিয়ে দিয়েছে। এখানে এই আমার শেষ কাজ। খগেনবাবুকে বাড়ীতে পাঠাতে পারলেই এই কৃত্তিমতার জীবন যাত্রা হ'তে অবসর নেব মনে করছি। সেদিন সত্যেনবাবু ঠিকই বলে গিয়েছিলেন যে প্রতিহিংসা নেবার পথ এ নয়। নীচের অন্ধকারকেই আমি বাড়িয়ে চলেছি, উপরে ওঠার পথ দেখাতেও পারি না আর দেখতেও পাই না। আপনি বলে গিয়েছিলেন বোনের মর্য্যাদা নিয়ে আপনার সামনে দাঁড়াতে। এখান হ'তে মুক্তি নিয়ে সেই সাধনাই করবো।

ইতি—রেখা।

আমার উপর শুধু খগেনবাবুর সন্দেহ কেন আজ সন্দেহ সবারই। মঞ্জুকে নিয়ে শুনেছি এখানকার সহকর্ম্মীদের মধ্যে একটা গোপন আলোচনা হচ্ছে; এমন কি হাঁসপাতাল পরিচালক-মণ্ডলীর মাঝেও উঠেছে মঞ্জুর প্রসঙ্গ। কিন্তু কেন? একজন অসহায়া নারীকে বোনের মর্য্যাদা দিয়ে রাখা যায় না কি নিজের কাছে! পৃথিবীর নৈতিক বোধ আজ কি এত অসহায় হ'য়ে পড়েছে! বন্ধু সহকর্ম্মী সুধীরের আগমনে চিন্তাসূত্রে বাধা পড়ে।

—এসো কি খবর?

সুধীর একটা চেয়ার টেনে বসে বলে—তোমার শরীর কেমন সমরদা?

—ভাল নয়। শরীর ও মনটা বড়ো মুসড়ে পড়েছে।

—আরো দিন কতক বিশ্রাম নাও, ঠিক হয়ে যাবে। হাঁ একটা খবর দিতে এলাম। পরিচালক-মণ্ডলীর মধ্যে মঞ্জুদেবী সম্বন্ধে যে গোপন আলোচনা হ'য়েছে তার সূত্র খুঁজে পেয়েছি। সেই গোপন বৈঠকে যতীন্দ্রবিমলবাবু উপস্থিত ছিলেন।

—তা আমিও অনুমান করেছিলাম। তাছাড়া আমার এখানকার সহকর্ম্মীরাও বেশ মুখরোচক আলোচনা করছে।

সুধীর বলে—ওটা আজকাল আমাদের স্বভাব হ'য়ে দাঁড়িয়েছে সমরদা। মিথ্যে জেনেও তাকে ফেনিয়ে ফেনিয়ে বড় করতে আমাদের ভাল লাগে। হয়তো এইটাই মানুষের স্বভাব।

—আমি তোমার একথা মেনে নিতে পারছি না সুধীর। সব

দেশের মানুষের স্বভাব এ নয় আমি দেখেছি। এদেশের মানুষ-গুলোব জীবনধারা সহস্র শৈবালদামে আটকে গেছে রবীন্দ্রনাথের ভাষায়। মজা নদীর বুকে মুক্ত জোযারের ধাবা এখনো আসেনি সুধীর।

—এ অতি সত্য সমরদা।

—যাক ওসব কথা। তোমার মেয়ে কেমন আছে?

—জ্বরটা সেবেছে; তবে বড়ো দুর্ব্বল। চলি এখন, এখুনি ওয়ার্ডে বেরুতে হবে।

—আমি ছুটি নেওয়ায় তোমার উপর খুব বেশী চাপ পড়েছে জানি। তবে এখানকার সব কাজের ভার একদিন তোমাকেই তো তুলে নিতে হবে।

সুধীর বিস্মিত দৃষ্টিতে জিজ্ঞাসা করে—তাব মানে?

—তার মানে তোমাদের এখান হ'তে শেষ বিদায় নেব মনে করছি।

—তুমি এখান হ'তে চলে যাবে। কে কোথায় কি আলোচনা করলো এ সব তুচ্ছ ঘটনা তো তোমায় কোনদিন বিচলিত করে না। এই হাঁসপাতালের সঙ্গে শুধু তো তোমার চাকরীর সম্বন্ধ নয়। এর ইঁট-পাথর, কাট, এর যন্ত্রপাতি সবই তোমার হাতের প্রথম স্পর্শে উজ্জ্বল হ'য়ে আছে। তুমি একে ভুলতে পারবে বলে আমি বিশ্বাস করি না সমরদা।

—আমিও করি না। তবে—

—তুমি দিন কতক Change এ ঘুরে এসো। শরীর আর মন দুটোই ঠিক হ'য়ে যাবে। খোকন আর মঞ্জুদির সঙ্গে তুমিও বেড়াতে বেরোও না কেন? রাস্তায় মঞ্জুদির সঙ্গে দেখা হ'লে তোমার পাগলামির কথা বলে যাচ্ছি।

সুধীর চলে গেল, মঞ্জুকে নালিশ জানাবার ভয় দেখিয়ে। সর্ব্বনাশ এখুনি আরম্ভ হবে—কি হয়েছে বড়দা? শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে আপনাব। তারপর দুধের পরিমাণ বেড়ে যাবে, ফলের রস ঘন ঘন আসবে। খালি খান আর খান। সুধীরটা সব মাটি করে দেবে নিশ্চয়ই। শরতের অপরাহ্ন। উদাস মনে রবীন্দ্র-নাথের কবিতা মনে পড়ে আঁটী আঁটী ধান চলে ভারে ভার। কিন্তু সামনে ওকি! লাল কাঁকরের পথ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে চলে ক্ষুধিত মানুষের মিছিল। ওদের নুয়ে পড়া দেহটাকে সোজা করে ওরা চলতে চেষ্টা করছে। শীর্ণা বোনের দল ক্ষীণ কণ্ঠে চীৎকার করছে। ওদের কোলে ছেলেগুলো কাঁদতে সুরু করেছে হয়তো ক্ষুধায়। ওদের মায়ের বুকের সুধাভাণ্ড যে নিঃশেষ হয়ে গেছে। মিছিলের হয়না শেষ। ওরা চায় ক্ষুধার অন্ন, ওরা করে বাঁচার দাবী, ওরা বলে মরবো না আমরা। ওরা চায় প্রতিকার। কিন্তু প্রতিকার চাইছো কার কাছে? তোমাদের রক্ত শুষে যারা রক্তের চাপে ফেটে পড়ছে তাদের কাছে। না বন্ধু না! এ যুগের দধীচি, তোমাদের বুকের হাড়ে জ্বালিয়ে নাও বজ্রের ঝিকিমিকি; বুটের তলায় কঠিন মাটির বুকে তোমাদের ফিকে রক্তের পথ বেয়ে আসবে সার্থক

তোমাদের লাল টুকটুকে দিন।

খোকন এসে বলে—মামাবাবু আপনার অসুখ করেছে ?

জিজ্ঞাসা করলাম—কে বললে খোকন ?

—সুধীর কাকাবাবু মাকে বলছিলেন। আপনি নাকি এখান হ'তে চলে যাবেন।

—সুধীরের ওসব বাজে কথা। তোমার মা কোথায় ?

—মায়ের বড়ো মাথা ধরেছে। মা শুয়ে পড়েছে ; আমায় বললে আপনার অসুখের কথা জিজ্ঞাসা করতে।

—না না, আমার কিছু হয়নি। তুমি কিছু খেয়ে পড়তে যাও। তোমার এখন সর্দ্দি নেই তো।

—না মামাবাবু।

—আচ্ছা যাও। আর মায়ের মাথার যদি বেশী যন্ত্রণা হয় আমার কাছ হ'তে ওষুধ নিয়ে যেয়ো।

খোকন ঘাড় নেড়ে চলে গেল। মনটায় যেন একটা খটকা লাগলো। জ্বর অবস্থাতেও মঞ্জু আমার শরীরের তদারক করতে এসেছে আর আজ খোকনকে পাঠালো আমার অসুখের কথা জানবার জন্য। কিয়ৎক্ষণ পরে চা আর টোষ্ট নিয়ে এলো রামু।

রামুকে ধমকাই—এতগুলো টোষ্ট কেন রে ?

রামু বলে—আমি নয় মা।

—তোর মায়ের তো মাথা ধরেছে। শুয়ে পড়েছিল।

—আবার উঠে এসে টোষ্টগুলো করে দিলেন।

—আচ্ছা যা।

রামু চলে গেল। একটা টোষ্ট খেয়ে চায়ের বাটিতে মুখ দিয়েছি মঞ্জু এলো।

মঞ্জু বলে—টোষ্টগুলো ফেলে রাখলেন যে ?

—খাবার ইচ্ছা নেই।

—শরীর খারাপ হয়েছে নিশ্চয়ই।

—না শরীর খারাপ হয়নি।

—তাহলে টোষ্টগুলো নিশ্চয়ই ভাল হয়নি।

তাড়াতাড়ি বললাম—না না ভাল হয়েছে, একেবারে মচমচে। এই দেখ সব খেয়ে নিচ্ছি।

মঞ্জুর মুখে হাসির ছোঁয়াচ লাগলো।

খেতে খেতে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার মাথা ধরাটা একটু কমেছে নয় ?

মঞ্জু বলে—হাঁ একেবারেই ভাল হয়ে গেছে।

—খোকন বললে তুমি মাথা ধরার জন্য শুয়ে পড়েছ। এর মধ্যেই মাথাধরা ছেড়ে গেল ! আশ্চর্য্য ডাক্তারের বাড়ীর গুণ আছে দেখছি।

মঞ্জু হেসে বলে—মাথা ধরা না ছাড়লে কি আর দাদার খিদে বাড়তো। বেচারা টোষ্টগুলো প্লেটেই শুকিয়ে মরতো।

হো হো করে হেসে উঠলাম।

—সত্যি বলেছ তোমার টোষ্টগুলো এখন পেটের মধ্যে সজীব

হ'য়ে উঠেছে।

মঞ্জু কিন্তু কিন্তু করে বলে—আচ্ছা বড়দা আমি এবার রামনগর যাব মনে করছি।

—রামনগর, সেখানে তোমার যাওয়া কি এখন ঠিক হবে মঞ্জু? তবে তোমার আত্মীয়স্বজনও কোথাও বিশেষ কেহ নেই।

—না আমি রামনগরই যাব। যতীন্দ্রবিমলের সাধ্য নেই যে আপনার বোনের অসম্মান করে।

—অসম্মানের চেষ্টায় উত্ত্যক্ত করবে তো। আমি জানি কেন তুমি যেতে চাইছো। আমিও কদিন ভাবছিলাম তোমায় কোন নিরাপদ আশ্রয়ে পাঠিয়ে দিলে ভাল হয়। তবে কি জানো তোমার দাদা কোনদিন মিথ্যার কাছে পরাজয় স্বীকার করতে চায় না। মিথ্যার চ্যালেঞ্জকে সে হাসি মুখে বরণ করে নেয়, পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে না। তবে তোমার এখান হ'তে চলে যাওয়াই ভাল। জীবনে অনেক আঘাত সহেছ আর তার মাত্রা বাড়িয়ে লাভ কি?

মঞ্জু মাথা হেঁট করে বলে—আমায় ক্ষমা করুন বড়দা। আমার দাদার মাথা হেঁট করে এখান হ'তে কোথাও যাব না। তবে কিয়ৎক্ষণ আগে বাড়ী ফেরার পথে আপনাদের নতুন ডাক্তার মিঃ সরকারের বোন আমায় অপমান করলেন কিনা; তাই মনটা বড় চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিল।

—তুমি তো জানো মঞ্জু মিঃ সরকারের বোন এই সেদিন তরুণ ডাক্তার সমরেশকে নির্লজ্জভাবে রাস্তায় পাকড়েছিল। আমি গিয়ে

পড়েছিলাম বলে তবে সে রক্ষা পায়। ওরা আলেয়া, উজ্জ্বল্য আছে, সত্ত্বা নেই, কিন্তু ক্ষুদে মিটমিটে তারার আলো অন্ধকারেও মানুষকে পথ দেখায় মঞ্জু।

আলোচনার মাঝে সত্যেন এলো। লালমাটির ধুলোর ছাপ লেগেছে তার সর্ব্বাঙ্গে।

মঞ্জু অভ্যর্থনা জানায়—এসো ঠাকুরপো। সর্ব্বাঙ্গ যে লাল করে ফেললে দেখছি।

হেসে উত্তর দেয় সত্যেন—পথে নেমে পথের ধুলোকে কি অস্বীকার করা যায় বৌদি। বড় খিদে পেয়েছে, শীগগির বৌদি।

—যাচ্ছি ঠাকুরপো। খিদে সহ্য করতে পারো না আবার বিপ্লব করবে।

সত্যেন একটা চেয়ারে নিজেকে এলিয়ে দিয়ে বললো—ক্ষুধার আগুন সমস্ত জগতে দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে বৌদি। সেই আগুন দেখেই তো আজ অন্নকাড়া মানুষের দল আঁতকে উঠেছে। সর্ব্বনাশী ক্ষুধা—তাকে নিঃশব্দে সহ্য করা পাপ বৌদি।

—আচ্ছা তোমার ঐ সর্ব্বনাশী ক্ষুধাকে শান্ত করছি ঠাকুরপো; তাহলে তো আর আগুন জ্বলবে না।

—না, না বৌদি তাহলে শান্তি।

সহাস্যে চলে যায় মঞ্জু। সত্যেনের কথাগুলো মনের মধ্যে বেশ ঘা দেয়। সত্যি সর্ব্বনাশী ক্ষুধা আজ আগুন জ্বালিয়েছে চারিদিকে। তাকে শান্ত না করলে সে আগুন আর নিভবে না।

সত্যেন বলে—বড়দা কিছু বলছেন না?

—ভাবছি সত্যেন এই সর্ব্বনাশী ক্ষুধা –

—থাকগে ও সব ভাবনা। আমি একটা সুসংবাদ দিচ্ছি বড়দা।

—বলো।

—আমার প্রবল প্রতাপান্বিত দাদা যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী তার কনিষ্ঠ সত্যেন চৌধুরীকে এতদিনে সর্ব্বহারা করেছেন। কৌশলে আমার অংশের সমস্ত সম্পত্তি নিজের দখলে এনেছেন।

—এই তোমার সুসংবাদ?

—নয় কেন বড়দা। নায়েব গোমস্তা আর প্রজাদের কাছে ছোট-বাবু আখ্যাটা এতদিনে ঘুচলো।

—কিন্তু এত লঘু করে দেখছ এই অন্যায়টা? সব হারিয়ে এত আনন্দ!

স্মিত হাস্যে সত্যেন বলে—সত্যি আনন্দ বড়দা। তবে অন্যায়ের প্রতিবাদও হয়েছে। বৌদি গৃহ ত্যাগ করে বাপেরবাড়ী চলে গেছেন। আমায় লিখেছেন—তার নামে যে সব সম্পত্তি আছে সেগুলো আমার নামে লিখে দিয়ে স্বামীর অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করবেন তিনি। হাঁ শুনুন, আরও খবর আছে। সতীশ ডাক্তার খুব দেশের কাজে মেতেছে। চন্দ্রবাবুর মেয়ে সীমা যে একদিন আপনার কাছে সতীশবাবুর নামে অভিযোগ জানাতে এসেছিল, আমার কাছে এক দীর্ঘ পত্রে সতীশ-বাবুর নামে অভিযোগ জানিয়েছেন। আর রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের রেখা দেবী আমার কাছে পথের নির্দ্দেশ চেয়েছেন। বলুনতো বড়দা

এই সব ঝঞ্ঝাটে এরা আমায জড়ায় কেন ?

আমি বললাম—হয়তো কোন ঝঞ্ঝাটেই তুমি জড়িয়ে পড়তে পারো না এই জন্যই।

মঞ্জু চা নিয়ে এলো আর চায়েব সঙ্গে এক প্লেট খাবার আর ফল। খাবার দেখে সোজা হ'য়ে বসলো সত্যেন।

সত্যেন বলে—ওরে বাবা এত মিষ্টি আবার ফল। যতো সর্ব্বহারা হচ্ছি বৌদি, বোনেদের আদর ততো বেড়ে যাচ্ছে। আর কথা নয়।

সত্যেন নিবিষ্ট মনে খাওয়া সুরু করলো। সত্যেনের শেষ কথাগুলো ঠিক বুঝতে না পেরে মঞ্জু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে আমি সত্যেনেব সম্পত্তি হারানোর সংবাদ বললাম।

সত্যেন খাওয়া শেষ কবে চায়ে চুমুক দিয়ে বললে—মিটিংএ সর্ব্বহারাদেব জন্য চিৎকার করে পেটটাও আমার সর্ব্বহারা হ'য়ে পড়েছিল। আপনার স্নেহের দান আবার তাকে পুর্ণ করে দিল বোদি।

—সে কি ঠাকুরপো সর্ব্বহারার অভাব কি দান নিয়ে পুরণ করবে নাকি ?

—না বৌদি, সর্ব্বহারার অভাব দানে পুরণ হয় না জানি। শোষণের কৌশলকে আড়াল করে রাখার জন্য আমাদের দেশে দানের এত ঘটা, শোষণকারীর রচিত ইতিহাস তাই দানকে দিয়ে গেল পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা। আগামী পৃথিবী যে অধিকারের ভিত্তিতে গড়া বৌদি, দানের প্রশ্ন সেখানে গৌণ। তবে কি জানেন বৌদি মায়ের জাতেরা এতো দেয় সেখানে আর দাবী করা চলে না।

নিজেকে নিঃশেষ করেই তারা দিয়ে দেয়, তাই তাদেব দানই এত মধুর বৌদি।

হেসে বললাম—হারলে তো মঞ্জু, পারবে কি করে সাহিত্যিকেব কাছে।

নীচে মোটরের হর্ণ শোনা যায়। আলোচনায় বাধা পড়ে। সিঁড়িতে পায়ের শব্দ স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে! একি রেখা!

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে রেখা বলে—ডাক্তারবাবু—

—কি খবর রেখা?

—খগেনবাবুর অসুখ, এখুনি আপনাদের যেতে হবে।

উৎকণ্ঠিত ভাবে প্রশ্ন করলাম—কি অসুখ রেখা?

—অফিস হ'তে ফিরে বললেন গা টা বমি বমি করছে। দুবার বমি করলেন তারপর অচৈতন্য। ডাক্তার বলছেন এখুনি হাসপাতালে দেবার জন্য। আমার বিশ্বাস নেই হাসপাতালে। তারপর আপনার নাম করতেই তাঁর গাড়ীতেই পাঠিয়ে দিলেন আমায় আপনাকে নিয়ে যাবার জন্য। ডাক্তারবাবু শুনলাম আপনার ছাত্র।

—চলো চলো। সত্যেন তুমিও চলো। মঞ্জু খোকনকেও সঙ্গে নাও।

মঞ্জু যেন চলশক্তি হীনা হয়ে পড়লো। মঞ্জুর নিস্তব্ধতায় ভয় হলো আমার।

রেখা মঞ্জুর হাত ধরে বলে—চলুন মঞ্জুদি।

সত্যেন তার স্বভাবসিদ্ধ শান্ত ভাবে বলে ওঠে—এতে উৎকণ্ঠিত হবার কি আছে বৌদি। বড়দা যখন যাচ্ছেন।

১০

আমরা সকলে যখন রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের বাসায় উপস্থিত হলাম তখন রাত্রি প্রায় আট-টা। খগেনবাবুর শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তার মাথার কাছে একটা চেয়ারে বসে আছে ডাঃ অরুণ। অরুণ আমার ছাত্র ছিল।

অরুণ তাড়াতাড়ি চেয়ার হ'তে উঠে বললে—আসুন স্যার, এখন মনে হচ্ছে অবস্থা ভালো।

নাড়ী দেখে বললাম—পালসের অবস্থা এখন ভালো দেখছি। খুব শীঘ্র জ্ঞান হ'তে পারে।

অরুণ বললে—ফুড পয়জ্‌ন বলে মনে হচ্ছে। প্রথমে আমিও চিন্তিত হয়ে পড়েছিলাম।

অরুণ এখন একজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ ডাক্তার। চিকিৎসায় তার কোন ত্রুটিই হয়নি।

আমি বললাম—আচ্ছা অরুণ তুমি কি মনে করো এখন হাস-পাতালে পাঠানো দরকার?

—আমি প্রথমে তাই বলেছিলাম, কিন্তু রেখা দেবী অমত

করলেন। তবে আমার নর্সিং হোমে যদি পাঠিয়ে দেন আমি সব সময়ে দেখতে পারি।

—এতো খুব ভাল প্রস্তাব অরুণ। কি বলো মঞ্জু ?

রেখা বলে—মঞ্জুদির এতে আর অমত করার কি আছে ?

অরুণ বললে—আপনি আছেন তবে আমি যাই, যাবার বন্দোবস্ত করি। আর আপনিও থাকবেন আমার বাড়ীতে আজ। আমার নার্সিং হোম আপনাকে দেখাব ; আজ আমার সৌভাগ্য।

অরুণ চলে গেল। কিয়ৎক্ষণ পরে জ্ঞান হলো খগেনবাবুর। অস্পষ্ট কণ্ঠে রেখার নাম ধরে ডেকে তাকে খুঁজতে লাগলো খগেনবাবু। মঞ্জু শয্যাপার্শে বসে তার মাথায় হাত বুলাচ্ছিল। খগেনবাবু পুনরায় রেখাকে খুঁজছে।

রেখা খগেনবাবুর মুখের কাছে এসে বললে—মঞ্জুদি এসেছেন, খোকন এসেছে দেখুন।

—মঞ্জু এখানে ?

—আপনাকে নিয়ে যেতে এসেছেন।

—খোকন কৈ ?

খোকন খগেনবাবুর আরো মুখের কাছে এগিয়ে বলে—এই যে বাবা আমি।

হাত দিয়ে খোকনকে খুঁজতে খুঁজতে খগেনবাবু আবার অচৈতন্য হয়ে পড়েন। খগেনবাবুকে অরুণের নার্সিং হোমে পাঠিয়ে অরুণের বাড়ী যাবার জন্য সত্যেন আর আমি মোটরের কাছে দাঁড়িয়েছি,

রেখা এলো।

স্মিতহাস্যে রেখা বলে—বড়দা এবার আমার ছুটি। আমার এখানের কাজ শেষ। আমি এখান হ'তে চলে যাচ্ছি।

—কোথায় যাচ্ছো রেখা?

—কলিকাতার কিছু দূরে দূর-সম্পর্কের এক বোনের বাড়ী। মাষ্টারী করে সে। দেখি যদি একটা মাষ্টারী জোগাড় করতে পারি। আপনি বলেছিলেন বোনের মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে আপনার সামনে। এখানকার সব ছেড়ে আপনার বোন আজ মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে বড়দা।

—ও মাথা যেন আর নীচু হয়না বোন।

রেখা বলে—সত্যেনবাবু আপনার কাছে চেয়েছিলাম পথের নির্দ্দেশ। বিলাস বৈভব সব ছেড়ে এবার পথে নেমে এসেছি—দারিদ্র আর জীবন সংগ্রামের কাঠিন্যের মধ্যে। এবার নিশ্চয়ই আপনার সাহায্য পাব।

ধরা গলায় সত্যেন বলে—আমি তো পথিক রেখা দেবী। পথে যখন নেমেছেন পথের মাঝে নিশ্চয়ই আবার দেখা হবে।

হঠাৎ রেখা আমার পায়ের উপর মাথা নুইয়ে প্রণাম করে।

সত্যেনকে প্রণাম করতে গেলে সত্যেন বলে ওঠে—একি করছেন রেখা দেবী, মাথা উঁচু করে রাখুন।

—তাতো রাখবই। কিন্তু যারা মাথা উঁচু করার মন্ত্র শিখাল তাদের কাছে মাথা নোয়াতে লজ্জা নেই সত্যেনবাবু।

জিজ্ঞাসা করি—তুমি চলে যাচ্ছ এরা কি জানে ?

—চলে যাচ্ছি জানে তবে একেবারে যাচ্ছি জানে না।

—আমরা কি তোমায় পৌঁছে দিতে পারি না রেখা ?

—আপনার বোন পথে নেমেছে বড়দা, পথের ভয় তাকে তুচ্ছ করতে দিন। চললাম বড়দা।

—আশীর্ব্বাদ করি বোন।

হন হন করে চলে যায় রেখা রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীট ধরে। দূরে জনতার মধ্যে মিলিয়ে না যাওয়া পর্য্যন্ত আমরা অপলক দৃষ্টিতে তার দিকে চেয়ে থাকি।

—চলো সত্যেন এবার যাই। রেখা আর মরবে না ও বাঁচবেই।

কমরেড বলে—শুধু ও নয় বড়দা, এই কুখ্যাত পল্লীর সব মা বোনেরাই একদিন বেঁচে উঠবে। নারীত্বের অপমানকারীদের দিন ফুরিয়ে আসছে।

আসুক আসুক তাদের দিন ফুরিয়ে। নতুন সমাজ এই হতভাগিনীদের বুকে স্থান দিক। ভালবাসায় দিক এদের মর্য্যাদা। অরুণের নার্সিং হোমে দিনের দিন খগেনবাবু সুস্থ হয়ে উঠতে লাগলেন। আমি প্রায়ই দেখতে যেতাম।

খগেনবাবু বললেন—ডাক্তারবাবু এবার তো সুস্থ হয়ে উঠেছি। এবার রামনগর যাবার বন্দোবস্ত করে দিন।

অরুণ বললে—আরো দুচার দিন থেকে যেতে পারেন। তবে দেশে গিয়েও বিশেষ অসুবিধা হবে না। এতদিন যে

সেবা মঞ্জুদি করলেন।

সগর্ব্বে বলে উঠলাম—আমার বোন অরুণ, তোমার ট্রেণ্ড নার্সকেও হার মানিয়ে দেবে।

—তাতো দেখলাম।

—আচ্ছা তাহলে কালই যাওয়া হবে। আমি এসে নিয়ে যাবো। একটা খবর দিয়ে দেব সত্যেনকে কেমন ?

খগেনবাবু সম্মতি জানায় ঘাড় নেড়ে। পরের দিন দুপুরে খগেনবাবুকে নিয়ে গেলাম আমার বাসায়। অপরাহ্ণে বেশ জমে উঠলো চায়ের আসর। সুধীর এলো।

সুধীর বলে—বাঃ বেশ জমে উঠেছে তোমার সংসার।

হেসে বললাম—জমবে বৈ কি! তবে কিনা একদিনের জন্য।

খগেনবাবু বললেন—একদিন কেন, আপনি চিরদিনই জমিয়ে রাখতে পারেন ডাক্তারবাবু।

—তা কি করে সম্ভব খগেনবাবু, আপনাদের কি এক দিনের বেশী এখানে ধরে রাখতে পারি ? মঞ্জুতো একেবারে নার্সিং হোম থেকেই রামনগর যেতে চাইছিলো।

খগেনবাবু হেসে বলেন—আপনি ইচ্ছা করলে কতো মঞ্জু যে আপনার সংসার জমিয়ে রাখতে পারে তার কি ইয়ত্তা আছে। কি বলেন সুধীরবাবু।

খগেনবাবু নিজেই হো হো করে হেসে ওঠেন। সুধীর কিছু বলে না কিন্তু তার মুখখানা কালো হয়ে যায়।

—আপনি কি বলছেন আমি বেশ বুঝতে পারছি না খগেনবাবু। —বলে বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকি খগেনবাবুর দিকে।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি উত্তর দিয়ে এ আলোচনার যবনিকাপাত করতে চেষ্টা করে—অসুখ করে ওর মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে বড়দা, কি যে বলে তার মানে হয় না। আচ্ছা বড়দা সত্যেন ঠাকুরপো তো এখনও এলেন না ?

—সংবাদ দিয়েছি নিশ্চয়ই আসবে।

মঞ্জু বলে—সুধীরবাবু আজ এখানে আপনার নিমন্ত্রণ। না, না অমত করবেন না। বোনের হাতের রান্নাতে তো কোনদিন আপনার অরুচি দেখিনি।

আমি বললাম—না, না মঞ্জু ও তোমার রান্নার একজন মস্তবড় ভক্ত।

শীতের অপরাহ্ন। সন্ধ্যা এসে তার রুক্ষতাকে তাড়াতাড়ি ঢেকে দিল। আমাদের নানা রকম আলোচনা বেশ জমে উঠেছে। মঞ্জু পুনরায় চা নিয়ে এলো। সত্যেন এসে দাঁড়াল দুয়ারের সামনে। সত্যেনকে প্রথম দেখেই মঞ্জু বলে ওঠে—এই যে ঠাকুরপো এসো।

মঞ্জু চুপ করে যায় ; দেখি সত্যেনের পিছনে রেখা।

সত্যেন বলে—আপনার এই বোনকে এইমাত্র গুণ্ডার কবল হ'তে উদ্ধার করে আনছি বড়দা। বৌদি রেখা দেবী শ্রান্ত, ওর একটু বিশ্রামের বন্দোবস্ত করুন। আর আমায় একটু চা পাঠিয়ে দিন।

রেখার সামনে গিয়ে ডাকলাম—রেখা—

রেখা মুখ তুললে ; তার চোখের কোনে অশ্রুবিন্দু মুক্তার মতো জ্বলে উঠছে।

রেখা বলে—বড়দা।

—জীবনের শত বিপর্য্যয়ের মধ্যেও আমার বোনেরা মাথা তুলে দাঁড়িয়ে থাকুক। একি তুমি এখনও কাঁপছ।

মঞ্জু তাড়াতাড়ি এসে রেখার হাত ধরে বলে—চলো ভাই বিশ্রাম করবে।

মঞ্জু রেখাকে নিয়ে চলে গেল।

সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করি—কি ব্যাপার সত্যেন ?

সত্যেন একটা চেয়ার টেনে বসে বলতে সুরু করে—আজ তিন চার দিন কলকাতায় ছিলাম একটা বিশেষ কাজে। রথতলার নির্জ্জন পথ দিয়ে হেঁটে আসছিলাম আপনার এখানে। দেখি রাস্তায় একটা গাড়ী দাঁড়িয়ে আর পাশের বনের মধ্য হ'তে নারী কণ্ঠে কে বলে উঠলো—শয়তান তুই আমাকে মেরে ফেল্লেও স্বেচ্ছায় তোর প্রস্তাবে রাজি হবো না। সন্দেহ হলো, ড্রাইভারকে জিজ্ঞাসা করলাম বনের মধ্যে কারা। ড্রাইভার আমায় চিনতো। সে বলে—আমার বাবু একটা মেয়েকে জোর করে নিয়ে গেছেন। বনের মধ্যে ঢুকে দেখি রেখা ক্রুদ্ধ ফণিনীর মতো মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে আর বাংলার খ্যাতনামা মিল মালিক মিঃ দত্ত জড়িত কণ্ঠে হুঙ্কার ছাড়ছে। কলম ধরা লেখকের শীর্ণ হাত দুটোতেও আগুন জ্বলে উঠলো বড়দা। দিলাম দত্তর গালে এক চপেটাঘাত। দত্ত টলতে টলতে সামলে

নিয়ে বললে—দেখা যাবে। হেসে বললাম—দেখাদেখির পালাটা এইখানেই শেষ হ'য়ে যাক মিঃ দত্ত। মিঃ দত্ত ক্রুর দৃষ্টি হেনে টলতে টলতে চলে গেল। রেখাদেবী আর আমি বনের মধ্য হ'তে বেরিয়ে দেখি মিঃ দত্তর গাড়ী ছুটে চললো কলকাতার দিকে। এই হলো ঘটনা। রেখাদেবীর কাছে জেনেছি, মিঃ দত্ত তাকে চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে স্কুলের প্রধানা শিক্ষয়িত্রীর কাছে নিয়ে যাবার নাম করে ঐ বনের মধ্যে নিয়ে আসে।

খগেনবাবু বললেন—এতো ওদের নিত্যকার ব্যাপার সত্যেন। রেখা সম্ভবতঃ মিঃ দত্তর কাছে আরো কিছু আদায় করার মতলবে ছিল। ওদের ব্যবসাইতো ঐ।

সত্যেন উত্তর দেয়—না খগেনদা, রেখা ওপথ হ'তে নতুন পথে পা দিয়েছে। রাজা দীনেন্দ্র ষ্ট্রীটের নরককুণ্ড হ'তে ও বাহিরে চলে এসেছে।

খগেনবাবু হো হো করে হেসে বলে ওঠেন—তুমি ছেলেমানুষ সত্যেন ভায়া; ওদের ছলাকলা বুঝবে কি করে।

সত্যেন যেন একটু রেগে উত্তর দেয়—পেটের জ্বালায় ওরা ছলাকলা করতে হয়তো বাধ্য হয় কিন্তু ওদেরও যে দরদী প্রাণ আছে সে তো আমাদের থেকে আপনিই বেশী জানেন খগেনদা।

মঞ্জুর আগমনে এ আলোচনার ছেদ পড়ে। চা আর খাবার নিয়ে এসেছে মঞ্জু সত্যেনের তরে। সত্যেন খুব খুশী।

মঞ্জু বলে—তুমি সব খেয়ে নিয়ো ঠাকুর পো। নতুন অতিথির

কাছে আমি চলে যাচ্ছি।

—রেখা এখন অনেকটা সুস্থ হয়েছে মঞ্জু ?

মঞ্জু হেসে বলে—হাঁ বড়দা, রেখাদেবীর মুখে হাসি ফুটিয়ে দিয়েছি।

রাত্রি তখন প্রায় দশটা। অসুস্থ খগেনবাবু খোকনকে নিয়ে অনেক আগেই শুয়ে পড়েছেন। সত্যেন আর আমি পড়ার ঘরে বসে গল্প করছি, মঞ্জু আর রেখা এসে বসলো।

মঞ্জু বললে—কাল সকালে তো আমরা চলে যাচ্ছি বড়দা। এই নিন চাবি। বড় ট্রাঙ্কটার মধ্যে চারশো টাকা আছে আর আছে খরচের হিসাব।

মঞ্জু আঁচল হ'তে চাবির গোছা খুলে আমার হাতে দিল।

—খগেনবাবু তো আরও পনের দিন ছুটিতে থাকবেন। তোমাদের কাছে তো কিছু টাকা নেই। কিছু টাকা তুমি নিয়ে যাও।

মঞ্জু বলে—দুমাস মধুপুরে থাকবেন। ও টাকাতে আপনাদেরই কম পড়বে। আমরা চালিয়ে নেব। আমাদের জন্য এমাসে অনেক খরচ করেছেন।

রেখাকে বললাম—এখন তুমি সুস্থ তো ?

—হাঁ বড়দা।

—আমি পরশু সকালেই মধুপুর চলে যাচ্ছি। তুমি কি তোমার বোনের বাড়ীই যাবে ঠিক করেছো ?

—হাঁ বড়দা।

—কিন্তু নিজেকে বিকিয়ে না দিয়ে বর্ত্তমানে শহরের বিষাক্ত আবহাওয়ায় অনেক সময় মেয়েদের অর্থ উপার্জ্জন করা সম্ভব হয় না রেখা। আচ্ছা সত্যেন তুমি গ্রামের দিকে শিক্ষয়িত্রীর কাজ জোগাড় করে দিতে পার না ?

সত্যেন বলে—রামনগর হ'তে মাইল চারেক দূরে দেশবন্ধু বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য একজন শিক্ষয়িত্রীর দরকার। রেখাদেবী কি অল্প মাহিনায় ঐ নিভৃত গ্রামে থাকতে পারবেন ?

রেখা বলে— আমার কোন আপত্তি নেই বড়দা। শুধু থাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত হলেই হলো।

—এইতো সত্যেন রেখা রাজী আছে।

—বেশ তাহলে কাল সকালে আমার সঙ্গে চলুন রেখাদেবী।

আমি বললাম—সকালে নয়। সকালে মঞ্জুরা যাচ্ছে। তোমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করে দুপুরে যাবে।

পরের দিন সকালে মঞ্জু আর খগেনবাবুকে আমার গাড়ী করে পাঠিয়ে দিলাম রামনগর। খোকনের পরীক্ষা হয়ে গেছে, আমার সঙ্গে যাবে মধুপুর। যাবার সময় মঞ্জু বার বার নানা উপদেশ দিয়ে গেল—বিদেশে যেন সাবধানে থাকি। ওদের বিদায় দেবার সময় মনটা বড়ো আনন্দে ভরে উঠলো। ওদের দাম্পত্য জীবনে যে সন্দেহের কুয়াশা ঘনিয়ে উঠেছিলো তাকি এবার কেটে যাবে না ? লীলা যে ঘর বাঁধার নেশাতে নিঃশেষ হ'য়ে গেছে—মঞ্জু কি তা

সার্থক করে তুলতে পারবে না। দুপুরে সত্যেন আর রেখা বিদায় চাইলো।

সত্যেন বলে—এবার আমাদের বিদায় দিন বড়দা। অনেকটা পথ যেতে হবে।

—নিশ্চয়ই দেব। মঞ্জুকে কেমন লাগলো রেখা?

রেখা বলে—ভাল লেগেছে বড়দা। কাল রাত্রে ভাল করেই আলাপ হয়েছে। ও নিবিড় ভাবে ঘর বাঁধতে চায়, তবে বড়ো অভিমানিনী। শক্ত হাতে বাঁধতে পারবে কিনা জানি না। ওর উপর খগেনবাবুর সন্দেহ আজও কমে নি বড়দা।

—তা জানি রেখা। মঞ্জু বুদ্ধিমতী, হয়তো সে সব ঠিক করে চলতে পারবে। তবে আবার যদি যতীন্দ্রবিমলবাবুর দয়া হয় সে আলাদা কথা।

সত্যেন বলে—দাদা আর এখন বিশেষ বাড়ী হ'তে বার হয় না. বড়দা। দাদা আর তার সাঙ্গপাঙ্গদের প্ররোচনা সত্ত্বেও ঐ অঞ্চলে কৃষক আন্দোলন বেশ জোরদার হ'য়ে উঠেছে।

—সরকার যে জমিদারী দখল বিল পাশ করলেন ওতে চাষীদের কিছু কি সুবিধা হবে না সত্যেন?

—জমিদারদের বিপুল ক্ষতিপুরণ দিয়ে সরকার জমিদারী কিনে নিলেন। কিন্তু সে ক্ষতিপুরণের টাকা সরকার পাবেন কোথায়? আসলে ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের বাঁচিয়ে দেওয়া হলো। ভূমিহীন চাষীদের মধ্যে ভূমি বণ্টনের ব্যবস্থা করে ভূমি সংস্কার করা হলো

কৈ ? আর বিলে যেটুকু সুবিধে আছে দুর্নীতিগ্রস্থ আমলাতন্ত্রের লোভী গহ্বরে সেটুকুও নিঃশেষ হ'য়ে যাবে বড়দা।

—তা সত্যি সত্যেন। জাতির জীবনে ক্ষয় রোগ আজ এতো প্রবল আকারে প্রকাশ পেয়েছে যে শুধু প্রলেপ দিয়ে আর তা রোধ করা যাবে না। ঝাঁঝরা হৃদপিণ্ডটাকে পালটে সেখানে নতুন বসাতে হবে। কিন্তু ওরা ভয় করে নতুনকে।

কমরেড বলে—করুক ভয় বড়দা, দিক ওরা বাধা, নতুন আসবেই। নতুন পৃথিবীর সঙ্কেত আজ দুনিয়ার দিকে দিকে। নতুনের লাল রশ্মি পুরাতনের সকল জীর্ণতাকে পুড়িয়ে দিয়ে তার মধ্যে আনবে যৌবনের উদ্দাম ছন্দ।

—আর তোমাদের দেরী করাব না।

রেখা বলে—বড়দা !

—কিছু আর বলবার নেই রেখা। যে বন্ধুর সঙ্গে তুমি চলেছ, তার উপর রেখ বিশ্বাস। আমার এ বোনকে যখন রক্ষা করেছ তখন একে পথের মর্য্যাদা সংগ্রহ করতে নিশ্চয়ই তুমি সাহায্য করবে সত্যেন।

—করবো বড়দা।

ওরা চলে গেল। লাল কাঁকরের পথ বেয়ে ঐ তো ওরা এখনও চলেছে পাশাপাশি। একজন আদর্শবাদী সাহিত্যিক কিন্তু বাস্তবকেও সে অবহেলা করে না। নতুন পৃথিবীর পূজারী কিন্তু পুরাতনকেও মাড়িয়ে চলে না। সমাজে সম্মানিত সাহিত্যিক সত্যেন চৌধুরী।

আর একজন—এই সেদিনও দেহ বিক্রয়ের পঙ্ককুণ্ডে ডুবে ছিলো। ওঠবার চেষ্টা করছে আজ। আমরা ওকে কি শুধু ঘৃণাই করবো? আমরা পৃথিবীর মানুষ; আমরাই কি সৃষ্টি করিনা এই পঙ্ককুণ্ড? বন্ধু আজো কি আসেনি আত্মজিজ্ঞাসা তার আত্মবিশ্লেষণের দিন? এসেছে—

১১

এসেছে আজ গভীর আলোড়ন পৃথিবীর দিকে দিকে, মানুষের নিভৃত মনের কুয়াশা ঢাকা অন্তঃস্তলে—কবে হবে শেষ এ বৈষম্যের ? যুগ যুগান্ত ধরে পৃথিবীর বুকে বিরাজ করে একদিকে অপরিমিত ঐশ্বর্য্য, বিলাস অপরদিকে দুঃসহ দারিদ্র ; একদিকে নৈতিকমানের গর্ব্বোদ্ধত উচ্চশৃঙ্গ আর তারই পাশে ময়লা আস্তাকুঁড়েভরা গভীর খাদ। উঁচুর দেবতা খাদের আঁধারের মানুষকে চিরকাল শুনিয়ে আসে উপদেশ, সান্ত্বনা দেয় তাকে বিধিলিপির দোহাই দিয়ে। আঁধারের মানুষ শুধু নীচে থেকে দেখবে আলোর চোখ ঝলসানো দীপ্তি ; তাকে উপভোগ করার অধিকার নেই তার। বন্ধু, আজও কি হয়েছে এ বৈষম্যের ? আজকের গণতন্ত্রের যুগে গণতন্ত্রের মুখোস পরা বৈষম্য সুগারকোটেড কুইনিনের মতোই কি তার তিক্ততাকে ঢেকে রাখছে না। প্রত্যহ সংবাদপত্রের পাতা খুললেই কি চোখে পড়ে না দক্ষিণ আফ্রিকার বর্ণ-বৈষম্য, কেনিয়া, গায়না, মালয়, ইন্দোচীনে স্বাধীকার প্রত্যাশী মানুষের উপর শ্বেতাঙ্গ আভিজাত্যের নির্ম্মম নিষ্ঠুরতা। তবে স্বাধীকার প্রত্যাশী সর্ব্বহারা মানুষের কঠিন

আঘাতে বৈষম্যের উচ্চশৃঙ্গ আজ টলমল করে উঠেছে। পৃথিবীর নীচে বন্দী বাসুকী আজ গর্জ্জন করে উঠেছে। তার যুগ যুগের বঞ্চনা-মুক্তির নিশ্বাসের গর্জ্জনে আজ ভূমিকম্পের সূচনা। তাকে মুক্ত করো বন্ধু।

অবিরাম ছুটে চলা রেলগাড়ীর মধ্য হ'তে চেয়ে থাকি দূর দুরান্তের পানে। মিলিয়ে যায় রুক্ষ মাঠ কিন্তু হাওয়ায় ভরে আসে সোনালী ধানের সোঁদাগন্ধ। ধানের বোঝার ভারে নুয়ে পড়া কঙকালসার দেহগুলো মনকে দেয় পীড়া কিন্তু ওদের বাঁচার তাগিদ চোখে আনে ভবিষ্যতের সোনালীর স্বপ্ন। মন বলে ওরা বাঁচবে। ওদের কঙ্কালসার বুকে লাগবে পরিপূর্ণতার ছোঁয়াচ। ঠিক ঐ প্রভাত সূর্য্যের মতোই উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে ওদের আগামী দিনের জীবন-ছবি। মধুপুর ষ্টেশনে গাড়ী থামলো কখন নানা চিন্তার অগোচরে। কুলি আর রামুর সাহায্যে বেডিং বাক্সগুলি প্লাটফরমে নামিয়ে ফেললাম। রামুকে একটা ট্যাক্সি ডাকতে পাঠিয়ে কুলিদের মাথায় বেডিংগুলো তুলে দেবার বন্দোবস্ত করছি, দেখি পাশেই চন্দ্রনাথ।

—আরে সমর ভায়া যে।

—এই যে চন্দরদা মধুপুরের হাওয়ায় দিনকতক শরীরটাকে চাঙ্গা করবো বলে এলাম।

—বেশতো, কোথায় উঠছো?

—উদয়নে।

—আরে উদয়ন তো আমার বাড়ীর পাশেই। হাঁ, এই আমার

মেয়ে সীমা। আমার একমাত্র মেয়ে। সীমা, ইনি ডাক্তার রায়।

সীমা কপালে হাত ছুঁইয়ে বলে—নমস্কার কাকাবাবু।

চন্দ্রনাথ বলে—সীমার শরীরটা বড় খারাপ হয়েছে। বললাম চল দিনকতক মধুপুরে। যাক ভালই হয়েছে। তুমি আছ, সময় আমাদের ভালই কাটবে। এটি কে ?

—আমার ভাগ্নে খোকন।

—বেশ বেশ চলো আমার গাড়ী আছে। দুবারে আমরা চলে যাবো।

—না না আমিও গাড়ী ডাকতে পাঠিয়েছি।

আমরা উদয়নে এসে উঠেছি। উদয়ন আমার এক শিল্পী বন্ধুর বাড়ী। বন্ধু মাঝে মাঝে সপরিবারে এখানে এসে কাটায়। অন্য সময়ে এক মালীর পাহারায় থাকে উদয়ন। উদয়নের বৈশিষ্ট্য এর চারিদিকের ফুল ও ফলের বাগান। মরসুমী ফুল ও ফলে সব সময়েই এর প্রাঙ্গণ মুখরিত। এর প্রাচীরের পাশেই চন্দ্রনাথ বাবুর চন্দ্রনাথ কুটীর। চন্দ্রনাথ-কুটীরও বেশ সুসজ্জিত ; চারিদিকে জলের ফোয়ারা, নগ্ন নারীমূর্ত্তি, কৃত্রিম প্রস্রবন প্রভৃতি তার সৌন্দর্য্যকে বর্দ্ধিত করেছে। তবে উদয়নে আর চন্দ্রনাথ-কুটীরে পার্থক্য বেশ বুঝতে পারা যায়। উদয়নে কাব্যিক পরিবেশ—উদাসীমনকে আরো উদাস করে আর চন্দ্রনাথ-কুটীর মনে জাগায় সমৃদ্ধির নেশা। উদয়নের মালী কার্ত্তিক—বয়সে তার তারুণ্য আছে—সে বাঙালী। কিন্তু সে ঘর বেঁধেছে এক সাঁওতাল মেয়ের সাথে—নাম তার মালতী। নিঝুম

কালো মালতী কিন্তু তার সাদা শাড়ী আর কালো খোঁপার পাশে বেলমালতীর গুচ্ছ, তার কালোকে দিয়েছে এক অপূর্ব্ব রূপ। ময়ুর বাহন শ্রীমান কাত্তিক ময়ুরের পেখম তোলা রূপেরই হয়তো সন্ধান পেয়েছে সেথা। শ্রীমানের অন্তঃদৃষ্টি আছে দেখছি। উদয়নের খোলা বারান্দায় বিকালে বসেছে চায়ের আসর। সীমা এসেছে চন্দ্রনাথবাবুর সঙ্গে।

চন্দ্রনাথ বলে—দেখ সমরভায়া সীমার শরীরটাতো এখানে এসেও বেশ সারছে না। তুমি একবার ভাল করে দেখ ওকে। কাল সকালে আমার বাড়ীতে যেয়ে চা খাবে।

—আচ্ছা কাল সকালেই আমি দেখবো। এখানে শরীরটা ভাল লাগছে না মা?

সীমা বলে—বড়ো দুর্ব্বলতা মনে হয় কাকাবাবু।

খোকন বলে—সীমাদি চলুন না একটু বাগানে বেড়িয়ে আসি। মালতী অনেক ফুল তুলে রেখেছে।

—যাও না মা খোকনের সঙ্গে একটু বেড়িয়ে এসো। রোজ সকালে বিকালে উদয়নের ফুলবাগানে একটু বেড়াবে কেমন?

—বেড়াবো কাকাবাবু। আয় খোকন।

খোকনের সঙ্গে সীমা চলে গেল।

চন্দ্রনাথ বলে—তোমার কি রকম মনে হচ্ছে সমরভায়া? সীমা আমার একমাত্র মেয়ে। যতো টাকা লাগে ভাই, তুমি চিকিৎসার বন্দোবস্ত করো।

—কোন ভয় নেই চন্দরদা।

চন্দ্রনাথ বলে—তুমি বোধ হয় জানো না তোমার ছাত্র সতীশের সঙ্গে ওর বিয়ের সম্বন্ধ হয়। কিন্তু এমনি হতভাগা সে পাড়াগাঁয়েই পড়ে রইলো। তাছাড়া এখন তার চরিত্র সম্বন্ধেও অনেক কথা শুনছি।

—'ওসব তুমি ভুল শুনেছ চন্দরদা। সতীশ আমার ছাত্র, আমি তোমার থেকেও তাকে বেশী চিনি। তার মতো চরিত্রবান আজকাল খুব কমই পাওয়া যায়।

—সে যাকগে ও সব নিয়ে মাথা ঘামাই না। বিয়ে হলে ও সব শুধরে যেত। সতীশকে বললাম তুমি আমার কাছে থাকবে। বালীগঞ্জে একটা বড়ো ডাক্তারখানা করে দিচ্ছি; কিন্তু তাতে তার মত নেই। আমার বাড়ী সে থাকতে ইচ্ছুক নয়। তুমি তো জানো সমর সীমাকে আমি এক দণ্ড চোখের আড়াল করতে পারি না।

আমি উত্তর দিই—কিন্তু সতীশের থেকেও আরো ভাল পাত্র তুমি তো পেতে পার চন্দরদা। তোমার বিশাল সম্পত্তির সঙ্গে তোমার সুন্দরী মেয়ে।

—তাতো পারি ভাই। দু'তিনজন বিলাতফেরত পাত্র হাতে রয়েছে। কিন্তু কি জানো আজকালকার মেয়েরা বড়ো জেদী আর একগুঁয়ে। সীমা পণ করেছে সে সতীশকে ছাড়া আর কাকেও বিয়ে করবে না। এখন সে জিদ ধরেছে সে আদৌ বিয়ে করবে না। বলো তো ভাই এখন কি করি।

—আচ্ছা চন্দরদা, সতীশ যদি বিয়ে করে সীমাকে তার দেশের বাড়ী কিম্বা অন্য কোথাও নিয়ে যায়, যতো কষ্টই হোক তোমার তা মেনে নেওয়া উচিত।

চন্দ্রনাথ বলে—আমার কষ্ট না হয় সহ্য করলাম কিন্তু সীমার কষ্ট? সীমা আমার বাড়ীতে যে পরিবেশে থাকে সতীশ কি তা সৃষ্টি করতে পারবে?

—চন্দরদা, তোমাদের তথাকথিত আধুনিক সভ্যতার পুজোর প্রথম উপকরণ টাকা। কৃত্রিম জীবনযাত্রাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে যে জৌলুসের প্রয়োজন সতীশের তা সামর্থের বাইরে। তা ছাড়া সে তোমাদের এ জীবনযাত্রাকে ঘৃণাও করে।

—কিন্তু আজকের দুনিয়ায় প্রতিষ্ঠা লাভের একমাত্র উপায় আড়ম্বর আর কৃত্রিমতাকে বিদায় দিলে পাড়াগাঁয়ের সতীশ ডাক্তারের অন্ন জোটাও যে ভার হয়ে পড়বে সমর।

একটু উত্তেজিত হয়েই উত্তর দিলাম—তা ঠিক বলেছ চন্দরদা। তবে পাড়াগাঁয়ের সতীশ ডাক্তার শোষণের অন্ন দিয়ে পেট না ভরিয়ে দাবীর অন্ন জোগাড়ের পথে পা দিয়েছে। অন্ন তার জুটবেই। যাক ও সব কথা। কাল সকালে তোমার ওখানে যাচ্ছি।

চন্দ্রনাথ আমার হাত জড়িয়ে ধরে বলে—তুমি আমার সীমাকে বাঁচাও সমর।

পরদিন সকালে গেলাম চন্দ্রনাথ-কুটীরে। প্রাঙ্গনের মধ্যে ঢুকেই দেখি বাড়ীর মালী প্রাণনাথ আর তার বৌ ঝগড়া সুরু করেছে আর

তাদের কঙ্কালসার ছেলে দুটো উচ্চৈঃস্বরে কাঁদছে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কি হয়েছে প্রাণনাথ ?

প্রাণনাথের বৌ আমায় দেখে জড়সড় হ'য়ে বলে—দেখুন না ডাক্তার বাবু ছেলে দুটোর আজ চারদিন ধরে জ্বর। এতো বলছি গা করছে না। সারাদিন গাঁজা খাচ্ছে আর আড্ডা জমাচ্ছে।

গাঁজার নেশায় বুঁদ হ'য়ে আছে তখন প্রাণনাথ। কোটরাগত লাল চোখ দুটো জোর করে খুলে দুলতে দুলতে বলে উঠলো—আমি আড্ডা জমাই, গাঁজা খাই, ভদ্রলোকের কাছে আমার অপমান। দূর করে দেব আমার এখান থেকে।

প্রাণনাথের বৌ তখন রুখে উঠেছে। তার যৌবন আছে, শক্তি আছে, সে কেন ডরাবে ঐ নুয়ে পড়া প্রৌঢ় প্রাণনাথকে।

সে বলে—দেনা তাড়িয়ে দেখি একবার। চাকরি থাকবে তাহলে এখানে। এত বড়ো বাড়ী এত বড়ো বাগানের সব কাজই তো আমি করি।

ওদের ঝগড়া থামিয়ে দিয়ে বলি—ছেলে দুটোকে দেখছি কি হয়েছে।

প্রাণনাথ আস্তে আস্তে সরে পড়লো। ছেলে দুটোর দেখি পেটে পিলে, বুকে সর্দ্দি, কিছু বাকী নেই।

বললাম—আমি যখন বাসায় যাব তখন আমার কাছ হ'তে ওষুধ নিয়ে এসো। কিছু ভয় নেই।

মেয়েটি কাঁদ কাঁদ হ'য়ে বলে—আমাদের পয়সা কড়ি কিছু নেই।

—কিছু ভাবতে হবে না। পয়সা কড়ি লাগবে না। ওষুধ আনতে ভুলোনা যেন। আজ বার্লি, মিছরির জল এই সব খাবে।

দোতালার বারান্দায় উঠে দেখি চন্দ্রনাথ খবরের কাগজ পড়ছে। সে সোজা হ'য়ে বসে বলে উঠলো—আরে এসো সমরভায়া। ওমা, সীমা তোর কাকাবাবু এসেছেন। বামুনকে একটু চা-টায়ের জোগাড় করতে বল।

—আরে না না চন্দরদা। আমি এইমাত্র চা খেয়ে এলাম।

—আরে ভাই তা হোক।

সীমা এলো। সীমা বলে—কাকাবাবু আমার শরীরটা আজ ভাল মনে হচ্ছে।

চন্দ্রনাথ বলে— তাতো হবেই মা। তোমার কাকাবাবু রুগীর হাত দেখলেই তার রোগ অর্দ্ধেক সেরে যায়।

সীমার বুকটা পরীক্ষা করলাম।

চন্দ্রনাথ বলে—কেমন দেখলে সমরভায়া ?

—ভয়ের কিছু কারণ নেই চন্দরদা। প্রেসকিপ্সন করে দিচ্ছি ; ওষুধগুলো কলকাতা হ'তে আনিয়ে নাও। আর সীমা মা তুমি সবসময় খুব মন খুশী করে থাকবে। যখন এখানে ভাল লাগবেনা উদয়নে চলে যাবে। ওখানকার ফুলের বাগান মনো-মুগ্ধকর। আমার বড়ো ভাল লাগে মা।

সীমা বলে—আমারও বড়ো ভাল লাগে কাকাবাবু। তাছাড়া কার্ত্তিক আর মালতীকেও বেশ ভাল লাগে। ওদের হাসিখুশী বড়ো

চমৎকার।

—উদয়নকে তো ওরাই বাঁচিয়ে রেখেছে মা।

চন্দ্রনাথ বলে—দেখতো মা বামুন এখনও চা নিয়ে আসছে না কেন।

সীমা চলে গেল।

—ভয়ের কিছু কারণ নেই তো সমর?

—আমার তো মনে হয় না। এক্স-রে করারও আবশ্যক দেখছি না। তবে সীমা যাতে সব সময় আনন্দে থাকতে পারে তার বন্দোবস্ত করা উচিত। আমার মনে হয় ও বড়ো বেশী চিন্তা করে।

—তা করে। সব সময়েই দেখি চুপটি করে বসে আছে আনমনে। গান তো অনেকদিন গাওয়া ছেড়ে দিয়েছে।

বামুন আর সীমা লুচি নিয়ে এলো।

সীমাকে বললাম—তোমার কাকাবাবুকে একটা গান শোনালে না তো মা?

সীমা উত্তর দেয়—গান গাইতে আজকাল আমার ভাল লাগে না কাকাবাবু।

চন্দ্রনাথ বলে—সেকিরে আগে তো তুই আমায় যখন তখন গান শোনাতিস।

আমি বললাম—আচ্ছা মা যখন তোমার ভাল লাগবে গান শুনিও।

কিছুক্ষণ গল্পগুজব করে উদয়নে ফিরে এসে দেখি প্রাণনাথের বৌ এসেছে ওষুধের জন্য। তাকে ওষুধ তৈরী করে দিলাম।

সে বলে—জানেন ডাক্তারবাবু আমার মনিবরা এমন লোক ছেলেগুলোর হাতে একটু কিছু দেয় না। নেবু আপেল মিষ্টি খাবারের ছড়াছড়ি।

হেসে বললাম—মানুষের কেড়েকুড়ে নিয়ে যারা বড়ো হয় মানুষের প্রতি তাদের কি দরদ থাকে মা। তুমি আমার বাড়ী থেকে কিছু ফল নিয়ে যাও ছেলেদের তরে। আর কেমন থাকে জানিও।

প্রায় দুমাস কেটে গেল। এখানকার জল হাওয়া আর উদয়নের মনোমুগ্ধকর পরিবেশ মন ও শরীরটাকে বেশ সতেজ করে দিল। আর দিন কতক থেকে যাব মনে করেছি। সীমা সকালে বিকালে বেশীর ভাগ এখানে থাকে, গান শোনায়। ওর শরীরটাও সেরেছে অনেক। নানা আলেচনা হয় ওর সঙ্গে। তবে সতীশ আর মঞ্জুর প্রসঙ্গ এসে পড়লেই ও ভয়ানক চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। মনে হয় সতীশকে না পাওয়ার মূলে ও দায়ী করেছে মঞ্জুকে। মাঝে মাঝে মঞ্জুর চিঠি পাই; ওর চিঠির মধ্যে থাকে ওখানকার সব সংবাদ। কিন্তু দাম্পত্য জীবনের কোন দুর্যোগের কথার ওর চিঠিতে আভাষ মেলে না। মনে হয় ওরা সুখেই আছে। সত্যেনের একটা চিঠি পেয়েছিলাম অনেক দিন আগে, তাতে ও জানিয়েছিল ও অঞ্চলের কৃষক আন্দোলন বেশ জোরদার হ'য়ে উঠেছে। সতীশ আর রেখা সাধারণ মানুষের বাঁচার আন্দোলনে তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

ছেঁড়া চিঠি

সীমার কথা জানিয়ে সতীশকে একখানা চিঠি দিয়াছিলাম কিন্তু আজ পর্য্যন্ত তার উত্তর মেলে না। সেদিন দুপুরে খাওয়া সেরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে চেয়ে আছি উদয়নের মনোমুগ্ধকর ফুলের বাগানের দিকে, খোকন একটা চিঠি নিয়ে এলো।

খোকন বলে — মামাবাবু আপনার চিঠি।

খোকনের হাত হ'তে চিঠি নিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম—তোমার সীমাদি আসেনি এখনও ?

—এখনও আসেনি। ঐ যে আসছে সীমাদি।

খোকন দৌড়ে চলে গেল। চিঠি খুলে দেখি সতীশ লিখেছে—

বড়দা,

আপনার পত্র ঠিক সময়েই পেয়েছিলাম কিন্তু এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছি যে উত্তর দেব দেব করেও পারিনি। অক্লান্ত পরিশ্রমে হঠাৎ সত্যেন অসুস্থ হ'য়ে পড়েছে। প্রায় কুড়িদিন আগে একদিন সন্ধ্যা-বেলায় রামনগর বয়স্ক শিক্ষাকেন্দ্রে পড়াতে পড়াতে হঠাৎ মাথা ঘুরে অচৈতন্য হয়ে পড়ে। বহুক্ষণ পরে তার জ্ঞান হয়। তার অনিচ্ছা সত্ত্বেও জোর করে তাকে শয্যাগ্রহণ করান হয় কারণ তখন ভাগচাষী আন্দোলন বেশ দানা বেধে উঠেছে। এবং সেই আন্দোলনে সত্যেনের আবশ্যক ছিল সব চেয়ে বেশী। সমস্ত কাজের ভার পড়লো আমার উপর। সত্যেনের সেবা শুশ্রূষাই বা করে কে ? ওর বৌদি চিঠি লিখে অনুরোধ করলো আমায় ওর ভাল চিকিৎসার জন্য। চারিদিক অন্ধকার দেখলাম। ভাবলাম মঞ্জুদির শরণাপন্ন

হই কিন্তু রেখাদেবী এসে ভার নিলেন সত্যেনের। তার শুশ্রূষায় সত্যেন এখন প্রায় সুস্থ হয়ে এসেছে। রেখাদেবীর স্কুলের চাকরিও টলমল করছে। যতীন্দ্রবিমলবাবু নানা দুর্নাম রটিয়ে চেষ্টা করছেন রেখাদেবীকে এখান হ'তে তাড়াতে। হয়তো তার চেষ্টা সফল হবে। খগেনবাবুর বাড়ীর অবস্থাও বড় গোলমেলে। খগেনবাবু মঞ্জুদির উপর আগের মতোই নির্যাতন চালিয়ে যাচ্ছেন। আপনি আমায় যাবার কথা লিখেছেন, আমার পক্ষে এখন তা অসম্ভব। আপনি জানতে চেয়েছেন সীমাদেবীকে আমার পক্ষে এখন গ্রহণ করা সম্ভব কি না? মনে হয় এ প্রশ্ন এখন তাকেই করা আবশ্যক এবং তিনিই এর উত্তর দিতে পারেন।' যে মাটির-পথে ধুলোকে পরম আপনার করে নিয়েছি হাই-হিল-সু সেখানে কি মর্য্যাদা হারাবে না বড়দা? দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের মধ্যে আরামের স্থান কৈ? সীমাদেবীকে আমি খুব বেশী করে জানতে চেয়েছি এবং তার বিরুদ্ধে কিছু অভিযোগ নেই আমার। যে বৈষম্যের স্বর্ণচূড়ায় আজ তার স্থান তাকেই ভাঙার ব্রত যখন নিষ্ঠার সহিত গ্রহণ করেছি তখন আমার হাতকে সবল করে তোলার সামর্থ কৈ সীমা দেবীর? আমার পথে তাকে নেমে আসতে বলারও দুঃসাহস নেই আমার। আমায় ক্ষমা করবেন।
ইতি প্রণত—সতীশ

পত্রটা পড়া শেষ করে ঝাপসা চোখে মুখ তুলেই দেখি সীমা এসে দাঁড়িয়েছে বারান্দার রেলিংএ ভর দিয়ে। শীতের রুক্ষ পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে নিজের দৃষ্টিকে আড়াল করে চিঠিখানা সীমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বললাম—পড়ো মা সতীশের চিঠি।

১২

আরো দিন পনের কেটে গেল। রেখার এক খানা চিঠি পেলাম। রেখা লিখেছে—

বড়দা,

বালিকা বিদ্যালয়ের চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছি। আজ রাত্রেই এখান হ'তে চলে যাব। সত্যেনবাবু অবশ্য নিষেধ করেছিলেন এ ভাবে চলে যেতে। কিন্তু তাঁর অন্যান্য কথা বেদবাক্যের মতো মানলেও, এ নিষেধ তাঁর অমান্য করতে বাধ্য হলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়াতে তাঁর কাছে শিক্ষা পেয়েছি; কিন্তু যে অন্যায় তাঁকে স্পর্শ করারও সাহস করে, তার প্রতিরোধ করতে গিয়ে তাঁর অপমানের বোঝা বাড়ানোর ইচ্ছা নেই। যতীন্দ্রবিমল প্রথমে আমার বিগত জীবনের ঘটনাগুলো নানা রঙ দিয়ে প্রচার করতে সুরু করলো, এমন কি কেমন করে সে নিজে একদিন আমায় পাপের পথে টেনে নিয়ে আসে তাও। মাথা তখনও নোয়াইনি। জানি আজ যে পথের সন্ধান পেয়েছি সমস্ত গ্লানি কালিমা মুছে মানুষ সেখানে পায় পূর্ণতার সন্ধান। কিন্তু শেষে যতীন্দ্রবিমল প্রচার সুরু করলো তার ভাই সত্যেনবাবুকে নিয়ে আমি নাকি অসুখের সেবার আড়ালে

ব্যাভিচারে লিপ্ত ছিলাম। মিথ্যার কাছে মাথা নুইয়ে সত্যেনবাবুর নিষেধ সত্বেও এখান হ'তে চলে যাচ্ছি শুধু এই জন্য, যাকে আমি দেবতার আসন দিয়েছি ভবিষ্যতে তাঁর মিথ্যা অমর্য্যাদাও আমি ঘটতে দেব না। তাই আমি চললাম সেই পথের সন্ধানে, যেখানে নেই যতীন্দ্রবিমল, নেই পচা সমাজব্যবস্থার নোংরামি। আপনার মতামত না নিয়েই এখান হ'তে চলে যাচ্ছি। ক্ষমা করবেন। ইতি—

রেখা

না, না রেখা ভুল করেছে। আজকের যে পথেই সে যাক দেখবে যতীন্দ্রবিমল সেখানে আছেই। পচনশীল সমাজের নোংরামিকে এড়িয়ে গিয়ে নতুন পথের সন্ধান মিলবে না, তাকে ধ্বংস করে সেই-খানেই তৈরী করতে হ'বে সৃজনশীল সমাজের নতুন পথ। চিঠিটা পড়ে বারান্দার ইজিচেয়ারে ক্লান্ত শরীরটাকে এলিয়ে দিলাম। মনে এলো নানা চিন্তার ভীড়। সংসারে এ রকম কতো রেখা আছে যারা বিফলতার জীবন হ'তে সফল জীবনের পথে চলতে চায় কিন্তু রেখার মতোই পারে না। এর কি কোন পথ নেই? লীলার কথা মনে পড়ে; তার শেষের দিনের চিঠিতে যে প্রশ্ন সে করেছিল আজও তা মুখর হয়ে ওঠে রেখা, সীমা আর মঞ্জুর মৌন জিজ্ঞাসায়।

সীমার ডাকে চিন্তার সূক্ষ্ম তারে ঘা পড়ে।

সীমা বলে—কাকাবাবু কতক্ষণ এসেছি। এমন তন্ময় হয়ে ভাবছিলেন।

—হাঁ মা, মনটা বড়ো ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো চিন্তার ভীড়ে।

এই মাত্র আমার এক হতভাগিনী বোনের চিঠি পেলাম কিনা ? সে যাক, একটা গান শোনাবে মা ?

—শোনাব কাকাবাবু।

সীমা ঘরের মধ্যে পিয়ানো বাজিয়ে গান সুরু করলো। সীমার কণ্ঠে একি গান ! এ যে আগামী দিনের জয়ধ্বনি, যেখানে থাকবে না দুঃখ, থাকবে না বৈষম্য। গানের ভাষা আর সুর মনকে যেন সতেজ করে দিল। সোজা হ'য়ে উঠে দেখি সামনে সতীশ।

—একি সতীশ যে !

—হাঁ বড়দা, এলাম বিশেষ কাজে।

—বসো সীমা গান করছে।

সীমা গান শেষ করে বাহিরে এসেই জিজ্ঞাসা করলো —কেমন লাগলো কাকাবাবু ?

সহাস্যে উত্তর দিল সতীশ—সুন্দর।

সতীশকে দেখে সীমা যেন একটু বিব্রত হয়ে পড়লো।

সে বললে—আমি তবে এখন যাই কাকাবাবু।

—সে কি মা, সতীশ এলো একটু চায়ের বন্দোবস্ত করো।

—করছি কাকাবাবু।

সীমা নীচে নেমে গেল রামুর খোঁজে।

—তারপর খবর কি সতীশ ?

—খবর অনেক বড়দা। প্রথমতঃ মঞ্জুদির খবর, তার উপর নির্যাতন চলছে পুরোদমে। ভয় হয় কোন দিন না সে

আত্মহত্যা করে বসে।

—আমার বোন ভুল করবে না সতীশ।

—সব জিনিষের কি একটা সীমা নেই বড়দা? নির্যাতন, অপমান অনেক সময় অনেক জ্ঞানী মানুষকেও তো বিচলিত করে তোলে। তারপর সত্যেনের শরীর অনেক ভাল। সে কলকাতায় ডাঃ বসুর চিকিৎসাধীনে আছে। রেখাদেবী আমাদের বাধা তুচ্ছ করে ওখান হতে চলে গেছেন।

—তার চলে যাওয়া ছাড়া পথ কি ছিল সতীশ?

—তা জানি বড়দা। তবে মিথ্যার কাছে পরাজয় স্বীকার করে রেখা দেবী ভুল করেছেন।

—কিন্তু মিথ্যার সাথে লড়াই এর তার পাথেয় কৈ সতীশ? তাকে আমরা হয়তো মর্য্যাদা দিতে পারিনি।

সতীশ বলে—যাক ওকথা। রামনগরে একটা রিলিফ সেণ্টার খোলবার বন্দোবস্ত হচ্ছে, আপনাকে তার প্রেসিডেণ্ট হ'তে হবে। আর আমি এই জন্যই এসেছি। যারা অবহেলিত, চিকিৎসার যাদের সামর্থ নেই তাদেরই জন্য এখানে হবে বেডের বন্দোবস্ত আর গ্রামে গ্রামে রোগ প্রতিশেধক ব্যবস্থা সম্বন্ধে প্রচার ও সাহায্য করা হবে।

—আমার আপত্তি নেই। তবে কি জানো সতীশ এ সমাজ ব্যবস্থায় যেখানে অধিক সংখ্যক মানুষ পায়নি ক্ষুধার অন্ন, সেখানে শুধু চিকিৎসা ব্যবস্থা খুব কার্য্যকরী হবে বলে মনে হয় না।

সতীশ উত্তর দেয়—তা জানি বড়দা। আমাদের এক সাথে

সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে রোগের বিরুদ্ধে আর দারিদ্রের বিরুদ্ধেও।

সীমা চা নিয়ে এলো।

সীমা বলে—রামুকে পেলাম না কাকাবাবু, আমি চা তৈরী করে নিয়ে এলাম। আমি এবার যাই।

—না মা, সতীশ এলো, ওর সঙ্গে একটু গল্প করো। আমি একবার রামুর খোঁজে যাই।

—না কাকাবাবু আমি এখন যাই।

চেয়ার হ'তে উঠে বললাম—কিন্তু সতীশ এখানে একা থাকবে মা।

সতীশ হেসে বলে—আমি তো আর ছেলে মানুষ নই বড়দা যে একা থাকতে ভয় করবে। ওর অনেক কাজ আছে। জোর করে কি ধরে রাখা যায় বড়দা।

সীমা রুক্ষ স্বরে বলে—ধরে রাখারও সামর্থ থাকা দরকার। আমি যাচ্ছি কাকাবাবু।

সীমা হন হন করে নেমে গেল।

সতীশকে বললাম—আচ্ছা সতীশ তুমি কি সীমাকে বিয়ে করতে পার না? সীমা যদি তোমার কাছে ফিরে যেতে চায়?

সতীশ শান্ত স্বরে উত্তর দেয়—আমার সব কথাই আপনাকে চিঠিতে জানিয়েছিলাম। আমার দুঃখে কাঠিন্যে ভরা চলার পথে সে যদি ফিরে যেতে চায় তাকে ফিরিয়ে দেবার আমার সাধ্য নেই বড়দা।

—চলো সতীশ একটু বেড়িয়ে আসি উদয়নের ফুল বাগানে।

বহুক্ষণ বেড়াতে বেড়াতে ক্লান্ত হ'য়ে চন্দ্রমল্লিকা কুঞ্জের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, দৌড়ে এলো খোকন।

সতীশকে জড়িয়ে ধরে সে বলে—কাকাবাবু, মা কেমন আছে?

—ভাল আছে খোকন।

খোকনের গলায় চন্দ্রমল্লিকার মালা।

সতীশ বলে—বেশ মালা তো।

খোকন উত্তর দেয়—মালতী গেঁথেছে। আপনার চন্দ্রমল্লিকা চাই? চলুন না কুঞ্জের মধ্যে। ওখানে অনেক তোলা আছে।

গোধুলির আবছা আঁধার তখনও বেশ ঘন হয়নি। আমরা কুঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলাম সরু পথ দিয়ে। সতীশ চলেছে সবার আগে।

সতীশ বলে—মালতী দাও না গোটাকতক চন্দ্রমল্লিকা।

কার্ত্তিক আর মালতীর সঙ্গে কিছুক্ষণ আগেই সতীশের আলাপ হ'য়ে গেছে। কিন্তু সতীশ যাকে মালতী অনুমান করলো সে তো মালতী নয়। একটা গাছের আড়াল হ'তে সামনে আসতেই দেখি সীমা।

সতীশ কিন্তু কিন্তু হ'য়ে বলে—আমি মনে করেছিলাম মালতী।

খোকন বলে—মালতী তাহলে ওপাশ দিয়ে চলে গেছে। দেখুন না কাকাবাবু মালতী কি সুন্দর করে সীমাদিকে সাজিয়েছে।

সীমা লজ্জায় মাথা হেঁট করে।

আমি বললাম—সীমা মা, তুমি আর ঠাণ্ডায় থেক না।

রাত্রির গাড়ীতেই সতীশ কলিকাতা চলে যাবে। রিলিফ সেণ্টার

সম্বন্ধে তার সঙ্গে অনেক আলোচনা হলো। সতীশের হাতে মঞ্জুকে একটা চিঠি লিখে দিলাম। সংক্ষিপ্ত চিঠি ; লিখলাম—

কল্যাণীয়া মঞ্জু,

সতীশের কাছে তোমাদের সব সংবাদ পেলাম। আমার বিশ্বাস আছে তুমি ধীর ও স্থির হ'য়ে সমস্ত বিবেচনা করবে। ভুলে যেয়োনা তুমি খোকনের মা। যদি কোন দিন অসহ্য মনে হয় তুমি খোকনের কাছে চলে এসো। আমি খুব শীঘ্রই এখান হ'তে চলে যাব। আশীর্ব্বাদ নিও। ইতি—

তোমার বড়দা।

সতীশ যে ভয় করছিল অত্যাচারে অপমানে মঞ্জু ভুল করতে পারে সেই জন্য এ চিঠি লিখলাম। রাত্রের গাড়ীতে সতীশ চলে গেল।

শোবার সময় খোকন বললে—জানেন মামাবাবু সীমাদি বিকালে একা বাগানে বসে খুব কাঁদছিল। আমার কাছ হ'তে কাগজ কলম নিয়ে চিঠি লিখে কাকাবাবুকে দিতে বললে। কিন্তু চিঠিটা আবার ছিঁড়ে ফেললে।

—তাই না কি ?

—আমায় কি বললে জানেন, আমি যেন এসব কথা কাকেও না বলি।

দেখছি সীমার মন সতীশকে পাবার তরে আজও উন্মুখ হয়ে আছে। বাধা মিথ্যা আভিজাত্য গর্ব্ব, বাধা ঘুনে ধরা আরামপ্রিয়

সমাজ ব্যবস্থার অচলায়তন।

সকালে বেড়াতে গেলাম চন্দ্রনাথ-কুটীর। দেখি চন্দ্রনাথ তার ভাবী জামাই বিলাত ফেরৎ ইঞ্জিনিয়ার শ্রীমান অশোকের সঙ্গে গল্প করছে। সীমার সঙ্গে মাস দুই পরে নাকি তার বিয়ে হবে।

চন্দ্রনাথ বলে—আরে এসো এসো সময় ভায়া।

অশোক বলে—আসুন মিঃ রায়।

—সীমা মা কৈ?

চন্দ্রনাথ বলে—এখনও ঘুম থেকে ওঠেনি। কাল সন্ধ্যা থেকে ওর শরীরটা খারাপ হয়েছে। রাত্রে কিছু খেলে না।

সীমা এলো, হয়তো আমার ডাক শুনেই। দেখি তার চোখ দুটো জবা ফুলের মতো লাল।

চন্দ্রনাথ বলে—একি রে তোর চোখ দুটো যে লাল হয়ে গেছে।

অশোক সীমার কাছে গিয়ে বলে—আপনার আর ভয় কি সীমা দেবী যখন মিঃ রায় এসে গেছেন। দেখুন তো মিঃ রায় সীমা দেবীর অসুখটা মনে হয় বড়ো জটিল।

জটিল তো নিশ্চয়ই। জটিলতার গ্রন্থি খোলবারইতো চেষ্টা করছি, কিন্তু পারছি কৈ?

সীমাকে বললাম—কাল সারা রাত্রি বোধ হয় কেঁদেছ নয় মা?

সীমা মাথা হেঁট করে।

চন্দ্রনাথ ব্যস্ত হ'য়ে বলে—কেঁদেছে, কাঁদবে কেন? কি হয়েছে মা তোর?

অশোক মন্তব্য করে—সীমা দেবী কি ছেলেমানুষ যে কাঁদবেন। এ আপনি কি অনুমান করছেন মিঃ রায় ?

—অনুমান আমি ঠিক করেছি অশোকবাবু। রোগীর মনের খবরটা যদি ডাক্তাররা না জানে তাহলে চিকিৎসার যে ভুল হবে। সীমা মা চলো উদয়নে, একটা গান শোনাবে। ওখানে গেলেই তোমার মন ভাল হ'য়ে যাবে, কেমন ?

—চলুন কাকাবাবু।

আরো কদিন কেটে গেল। চন্দ্রনাথকে সব কথা বলেছি ; বলেছি সতীশের সঙ্গে সীমার বিয়ে না হলে সীমা সুখী হতে পাববে না। সতীশের প্রতি ওর অনুরাগ আজও ম্লান হয়ে যায় নি।

দুমাসের অনেক বেশী হয়ে গেছে। এবার এখান হ'তে ফেরার বন্দোবস্ত সুরু করেছি ; চন্দ্রনাথ জিদ্ ধরলো আরো দিন কতক থেকে যাবার জন্য। ওরা যাবে এ মাসের শেষের দিকে। সহপাঠী বন্ধুর অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলাম না।

১৩

ফাল্গুনের অপরাহ্ণ। বারান্দায় বসে সীমার সঙ্গে গল্প করছি। শুষ্ক ও রুক্ষ বেশে সতীশ উপস্থিত হলো।

—একি সতীশ, তোমার এ রকম শুষ্ক ও রুক্ষ বেশ কেন? খবর কি?

—আমি কথা বলতে পারছি না বড়দা। এখন বোধ হয় অনেক জ্বর। সীমা একটু চা খাওয়াবে?

সীমা তাড়াতাড়ি একটা চেয়ার টেনে সতীশের সামনে দিয়ে বললো—তুমি বসো, আমি এখুনি চা নিয়ে আসছি।

সীমা নীচে নেমে গেল।

সতীশ চেয়ারে ঠেস দিয়ে বললো—খবর ভাল নয় বড়দা। মঞ্জুদি মারা গেছেন হাসপাতালে।

—মঞ্জু মারা গেছে হাসপাতালে!

—আসতে বড়দা। এখুনি খোকন শুনতে পাবে। তাকে এখন হয়তো না জানানোই ভালো। মঞ্জুদিকে হত্যা করা হয়েছে তবে সেও আঘাত হেনে গেছে এই সমাজ ব্যবস্থারই বুকে।

—ব্যাপার কি সতীশ ?

—বলছি বড়দা, বড় কষ্ট হচ্ছে।

সীমা চা নিয়ে এলো। চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে সতীশ বলে—আমি আর কথা বলতে পারছি না বড়দা। আমায় একটু শুইয়ে দিন।

আমি আর সীমা সতীশকে ধরাধরি করে ঘরের মধ্যে খাটের উপর শুইয়ে দিলাম। সতীশ আর কথা বলতে পারছে না। জ্বর দেখলাম প্রায় একশো চার ডিগ্রি। মাথাটা ধুইয়ে দেবার পর সীমা মাথায় জলপট্টি দিয়ে বাতাস করতে লাগলো।

সীমাকে বললাম—খুব বেশী শক লেগেছে মনে হচ্ছে। তুমি ততক্ষণ বাতাস করো মা, আমি কার্ত্তিককে বরফ আনতে পাঠাই।

মাথায় বরফ দেওয়া চলেছে। জ্বর একটু কমেছে কিন্তু ভুল বকতে সুরু করেছে সতীশ। ইতিমধ্যে চন্দরদা এসেছিল সন্ধ্যার পরে।

সীমা তাকে বলে দিয়েছে—সতীশবাবুকে এ অবস্থায় ফেলে আমি তো এখন যেতে পারছি না বাবা। জ্বরটা কমে গেলেই বাত করে চলে যাবো।

সীমাকে বললাম—রাত্রি প্রায় দশটা বাজে তুমি মালতীর সঙ্গে চলে যাও না।

সীমা বলে—এ অবস্থায় আমার তো যাওয়া চলে না কাকাবাবু। আবার ভুল বকা সুরু হয়েছে।

সতীশ বিড় বিড় করে বকতে বকতে চীৎকার করে ওঠে—না না মঞ্জুদি, এ হ'তে পাবে না ; চলুন আপনাকে বাড়ী বেখে আসি।

সীমা বলে—তুমি চুপ করো।

—আমি অন্য ওষুধ নিয়ে আসছি মা। যেটা দিয়েছিলাম তাতে দেখছি বিশেষ কাজ হচ্ছে না। তুমি ওকে উঠতে দিয়ো না।

ওষুধটা পালটে দেবার পর সতীশের ভুল বকা অনেকটা কমে গেল। অশোক এলো সীমাকে নিয়ে যেতে।

সীমা অশোককে বলে—আমার তো আজ রাত্রে যাওয়া হবে না অশোকবাবু। এ অবস্থায় একে ছেড়ে যাই কি করে। কাকাবাবু একা পেরে উঠবেন কেন।

অশোক বলে--সেকি সীমা দেবী আপনাব তো এখানে কোন ভাবেই থাকা চলে না।

—কেন ?

সীমাকে বলি—তুমি অশোকবাবুর সঙ্গে চলে যাও মা।

—অশোকবাবু আমার যাওয়া হবে না।

—সেকি সীমা দেবী আপনার কোনক্রমেই এখানে থাকা উচিত নয়

সীমা রুক্ষস্বরে উত্তর দেয়—উচিত অনুচিতের প্রশ্ন বিচার করার ক্ষমতা আমার আছে অশোকবাবু। আপনি বাবাকে বলবেন, সীমা আজ রাত্রে আসবে না।

অশোক বলে—বেশ।

অশোক রাগের ভাব দেখিয়েই চলে গেল। আমি আর অনুরোধ করলাম না সীমাকে বাড়ী ফিরে যাবার। সীমার ভালবাসার যে পরীক্ষা সুরু হয়েছে। সে উত্তীর্ণ হবেই। রাত্রি প্রায় ভুটোয় সতীশের জ্বর অনেকটা কমে এলো; ভুল বকাও বন্ধ হয়েছে।

সীমাকে বললাম—তুমি খোকনের কাছে শুয়ে পড়ো মা। সারা রাত্রি জাগলে তোমার আবার অসুখ করবে। সতীশের এখন জ্বর কমে গেছে, আর ভাবনা নেই।

বারবার বলাতে নিতান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেই সীমা শুতে গেল। ভোর বেলায় আবার সীমা এলো।

—সতীশের জ্ঞান হয়েছে মা। জ্বরও অনেক কমে গেছে। তুমি ওর কাছে বসো। আমি পাশের ঘরে একটু ঘুমিয়ে নিই। দরকার হলেই ডাকবে।

—আচ্ছা কাকাবাবু।

ঘুম ভাঙতে প্রায় আটটা বেজে গেল।

খোকন এসে বললে—কাকাবাবু এখন ঘুমুচ্ছেন মামাবাবু।

সতীশকে এসে পরীক্ষা করলাম। জ্বর অনেক কমে গেছে।

সীমা বলে—আপনাকে সকালে খুঁজছিলো।

—এসো মা বারান্দায় একটু বসি। খোকন তোমার কাকাবাবুর মাথায় বাতাস করে দাও।

সীমা আর আমি বারান্দায় এসে বসলাম। চন্দরদা এলো।

সে জিজ্ঞাস করলে—সতীশ কেমন আছে সমর ভায়া?

—এখন ঘুমাচ্ছে। বিপদের আর কোন কারণ নেই।

রামু চা দিয়ে গেল।

চন্দরদা বলে—সীমা মা চা খেয়ে চলো। কাল সারা রাত্রি তো ঘুমোও নি। ওখানে যেয়ে একটু বিশ্রাম করবে। অশোক কাল খুব রাগ করছিল। আমি তাকে বোঝালাম, ও অবস্থায় সতীশকে কি ছেড়ে আসা উচিত।

সীমা বলে—অশোকবাবু যতদিন ওখানে থাকবেন ততদিন আমি ওখানে যাব না বাবা। আমি আজ কলকাতা চলে যাবো। আমার কলেজ খুলেছে।

—সেকি মা!

—হাঁ বাবা এগারটার গাড়ীতেই চলে যাবো। সামনেই পরীক্ষা।

—তোমার তো পড়া তৈরী হয়নি মা। অসুখের জন্য পড়তেই পার না। পরের বছর পরীক্ষা দেবে। কি বলো সমর ভায়া সীমার এখন নিশ্চয়ই পড়া উচিত নয়?

আমি বলি—না। পরীক্ষা তোমার এবছর না দেওয়াই উচিত সীমা।

—পরীক্ষা না দিলেও আমি কিন্তু এখুনি কলকাতা চলে যাবো।

আমি বলি—কেন মা?

—আপনি তো সব জানেন কাকাবাবু। এ আর আমি সহ্য করতে পারছি না। চলো বাবা তুমি আমার যাবার বন্দোবস্ত করে দেবে।

সীমা চলে যাবার জন্য এগিয়ে যায়।

ঘরের মধ্য হ'তে খোকন ডাকে—সীমাদি, ও সীমাদি, কাকাবাবু তোমায় ডাকছেন এসো। এসো সীমাদি—

আমি বলি—সতীশ তোমায় ডাকছে মা।

সীমা ইতস্তত: করতে থাকে কিন্তু পরক্ষণেই ঘরের মধ্যে সতীশের কাছে চলে যায়।

চন্দ্রনাথ বলে—আমি তো সীমার কথা বেশ বুঝতে পারছি না সমর ভাই। আবার ওর শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?

আমি বলি—কিছুই হয়নি চন্দরদা; ও যা চায় তাই ওকে করতে দাও।

দুপুরে সতীশ অনেকটা সুস্থ হ'য়ে উঠলো। জ্বরটা রেমিসন হ'য়ে গেছে। তার শয্যাপার্শ্বে বসলাম। সীমা সতীশের তরে হরলিকস্ নিয়ে এলো।

হরলিকস্ খেয়ে সতীশ বলে—কাল হ'তে আপনাকে তো কিছুই বলতে পারিনি বড়দা। অনেক কথা বলার আছে; এখন সব বলবো।

জিজ্ঞাসা করলাম—মঞ্জু কিসে মারা গেল সতীশ?

সতীশ আস্তে আস্তে ব্যথিত কণ্ঠে বলে—তার করুণ মৃত্যুর জন্য আমরা সকলেই হয়তো দায়ী বড়দা।

—তোমার কি বলতে বড়ো কষ্ট হচ্ছে সতীশ? তবে থাক পরে শুনবো।

—না বড়দা, এখন আমি অনেক সুস্থ হ'য়েছি। সব বলবো। সেবার এখান হ'তে যাবার পর মঞ্জুদিকে আপনার চিঠি দিতে গেলাম। সন্ধ্যা তখনও হয় নি; সেই আবছা অন্ধকারে মঞ্জুদিকে বড়ো ম্লান

দেখাচ্ছিল। বললাম, মঞ্জুদি আপনার শরীর তো বড়ো ভাল দেখাচ্ছে না? মঞ্জুদি ম্লান হাসি হেসে বললেন, ডাক্তারদের চোখগুলোই সন্দেহাতুর। বললাম, রোগ ধরবার জন্য অনেক সময় রোগীর অন্তঃস্থল পর্য্যন্ত দেখতে হয় কি না। মঞ্জুদি হেসে বলেন, সতীশ ডাক্তারের সে চোখ হয় নি; বসুন চা করে দিই। কাজের অজুহাত দেখিয়ে চলে আসবার চেষ্টা করতে মঞ্জুদি হেসে বললেন, করবী গাছে ফুলের স্তবকগুলো সব শুকিয়ে গেছে সতীশবাবু; একটু অপেক্ষা করুন চা নিয়ে আসি। বাধ্য হ'য়ে বসলাম দাওয়ায়; সে দিনের ঘটনা মঞ্জুদিও ভোলেন নি। তারপর ওদের বাড়ী মাঝে মাঝে যেতাম খগেনবাবুর অনুরোধে। মঞ্জুদির চিকিৎসা করছিলাম।

সতীশ থামলো। মনে হচ্ছে ওর বড়ো কষ্ট হচ্ছে।

বললাম—তুমি একটু থামো। তোমার বড়ো কষ্ট হচ্ছে। সীমা খানিকটা গরম দুধ নিয়ে এসোতো মা।

সতীশ বলে—আমি এখন দুধ খাব না বড়দা। আমায় কষ্ট হচ্ছে না। পরশুর আগের দিন রাত্রে প্রায় তখন দশটা, শোবার ঘরে বসে একটা চিঠি লিখছি বাহির হ'তে নারী কণ্ঠের ডাক, ডাক্তারবাবু ভেতরে যেতে পারি? মুখ তুলে দেখি ঘরের মধ্যে মঞ্জুদি। কপাল হ'তে তার রক্ত ঝরছে। বললাম, এ কি করে হলো মঞ্জুদি? মঞ্জুদি বললেন, এর জন্য উতলা হবেন না সতীশবাবু। এ তো আমার নিত্যকারের পাওনা। আমি একটা কথা জানতে এলাম আপনার কাছে। মঞ্জুদির ক্ষতস্থানে ওষুধ লাগিয়ে দিলাম; রক্ত

পড়া বন্ধ হ'লো। মঞ্জুদি বললেন, আপনার সঙ্গে আমার ব্যভিচারের অভিযোগ আর কতদিন সহ্য করবো; কতদিন সইবো আর নির্যাতন? মঞ্জুদি আর কোন কথা বলতে পারেন না। আমার বিছানায় বালিশে মুখ লুকিয়ে গুমরাতে থাকেন। পাশে যেয়ে সান্ত্বনা দিয়ে বলি, জগতে কতো মিথ্যেকে যে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা হয় তার তো ইয়ত্তা নেই মঞ্জুদি। তবু মিথ্যে মিথ্যেই। চলুন আপনাকে বাড়ী রেখে আসি। মঞ্জুদি রেগে বলেন, বাড়ীতে যেখানে অক্ষম স্বামী নেশার ঝোঁকে বুঁদ হ'য়ে বিছানায় পড়ে আছে আর তার বন্ধু যতীন্দ্রবিমল তারই সামনে অপমান করে চলে যাচ্ছে। বিস্মিত হ'য়ে বলি, চলুন দেখি কোথায় সেই যতীন্দ্রবিমল। মঞ্জুদি বাধা দেন। বলেন, না আজ রাত্রে আমি সেখানে যাব না; আজ আপনার এখানেই থাকবো। ওরা যখন মিথ্যেকে নিয়ে সত্য বলে চালাতে চায় তবে হোক না মিথ্যেটাই একদিন সত্যি। মঞ্জুদির মুখে যেন প্রলোভনের হাসি। মঞ্জুদি আরো কাছে এসে বলেন, এসো না আজকের রাত্রি তোমার পাশে কাটাই। মঞ্জুদির মুখের দিকে তাকালাম; মঞ্জুদি আরো কাছে। সমস্ত শরীরে যেন একটা আলোড়ন বহে গেল। দৌড়ে ঘর হ'তে বাহির হ'য়ে গেলাম মার ঘরের দিকে। মা বাড়ী নেই, বোনের বাড়ী গেছেন। তার ঘরের মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিলাম। অনেকক্ষণ পরে নিজেকে সংযত করে শোবার ঘরে ফিরে এসে দেখি মঞ্জুদি চলে গেছেন। টেবিলের উপর একখণ্ড কাগজে লিখে রেখে গেছেন, সতীশ-

বাবু আর কোন দিন আপনাকে বিরক্ত করতে আসবো না। ভুল করেছি, ক্ষমা করবেন। আমি বাড়ী যাচ্ছি। পরের দিন সকালে ওদের বাড়ী যেয়ে মঞ্জুদিকে নির্যাতনের জন্য খগেনবাবুকে ভৎর্সনা করলাম আর ভয়ও দেখালাম। খগেনবাবু অন্যায় স্বীকার করে ক্ষমা চাইলেন। খগেনবাবু অফিস যাবার জন্য বাহির হয়ে গেলেন। মঞ্জুদিকে বললাম, মঞ্জুদি যদি বড়দার ওখানে যেতে চান পৌঁছে দিয়ে আসতে পারি। মঞ্জুদি বললেন, না সতীশবাবু বড়দাকে আর উত্যক্ত করতে চাই না।

বললাম—তুমি একটু থাম সতীশ, নিশ্চয়ই তোমার কষ্ট হচ্ছে।

সীমা গরম দুধ নিয়ে এলো। দুধটা খেয়ে সতীশ আবার বলতে সুরু করে।

—পরশু রাত্রি প্রায় বারটায় খগেনবাবুর বাড়ীর দিকে চীৎকার শুনতে পেয়ে ঘুম ভেঙে গেল। খগেনবাবুর বাড়ী গিয়ে দেখি আমাদের দলের কর্ম্মীরা এসে গেছে; মঞ্জুদি মেঝের উপর পড়ে আছেন আর খগেনবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে আছেন। আমি যেতেই সবাই বলে উঠলো, আগে দেখুন মঞ্জুদি বেঁচে আছেন কিনা। মঞ্জুদিকে পরীক্ষা করলাম, তার নাড়ী বইছে ক্ষীণ বেগে। তার প্রাথমিক চিকিৎসা করে হাঁসপাতালে পাঠাবার বন্দোবস্ত করলাম। খগেনবাবুকে বললাম, ব্যপার কি? খগেনবাবু নিরুত্তর। শুধু দেখলাম তার চোখের কোণে জল। বুঝলাম মঞ্জুদির যদি জ্ঞান না হয় তবে সবই রহস্যাবৃত হ'য়ে থাকবে। মঞ্জুদিকে নিয়ে গেলাম

হাসপাতালে। চার ঘণ্টার পর মঞ্জুদির জ্ঞান হয়। তারপর ছয় ঘণ্টা পরে তার মৃত্যু হয়। এই সময়ে তার জ্ঞান ছিল অটুট। সমস্ত বলে গেছেন মঞ্জুদি। আর আপনাকে দিয়ে গেছেন এই চিঠি। এ তার হাতের লেখা নয় লিখেছি আমি তবে ভাষা আর সই তার। চিঠি পড়লে সব বুঝতে পারবেন। চিঠিটা পকেটে আছে।

সীমা সতীশের জামার পকেট হ'তে চিঠিটা বাহির করলো। আমি সীমাকেই পড়তে বললাম। সে আরম্ভ করলো ধরা গলায়—

পুজনীয় বড়দা,

আপানার চিঠি ঠিক সময়ে পেয়েছিলাম। আপনা'র উপদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করবো ঠিক করেছিলাম। কিন্তু আজ খোকনকে আর আপনাদের ছেড়ে চলে যেতে হচ্ছে। খোকনের মা হ'য়ে থাকতে পারলম না এই রইল দুঃখ। তবে যাবার আগে আপনার বোন আঘাত দিয়ে গেল পচা ঘুনধরা সমাজের এক কর্ণধারের বুকে। রাত্রি প্রায় বারটার সময় স্বামী এলেন টলতে টলতে, দেখি শুধু তিনি একা নন সঙ্গে তার বন্ধু যতীন্দ্রবিমল। দুজনে ঘরে ঢুকতেই আমি ঘর হ'তে বাহিরে চলে যাচ্ছি, যতীন্দ্রবিমল আমায় কাপড় টেনে ধরলো। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। যতীন্দ্রবিমল ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে আমায় বিশ্রী ভাষায় সম্ভাষণ করতে লাগলো। উঠে দাঁড়ালাম কিন্তু তখনও আমার কাপড়ের অগ্রভাগ তার হাতে। স্বামী বিছানায় শুয়ে পড়ে নেশার ঝোঁকে বিড় বিড় করে বকছে। মনে পড়লো রাজা দুর্য্যোধনের সভায় মহা-

ভারতের দ্রৌপদীর কথা। অপদার্থ স্বামীরা বসে আছে পণের মর্য্যাদা রক্ষায়। সে ভক্তিও নেই যে সে যুগের কৃষ্ণ আজ মান রক্ষা করবে। বিছানার নীচে একটা ছুরি ছিল, সেটা যতীন্দ্রবিমলের অলক্ষ্যে সংগ্রহ করে নিলাম। যতীন্দ্রবিমল কাপড়ে টান দিতে সুরু করেছে। আমি ওর বুকের উপর পড়ে গেলাম। ও একহাতে আমার গলা জড়িয়ে ধরার সঙ্গে সঙ্গে ছুরি বসিয়ে দিলাম ওর বুকে। আর্ত্তনাদ করে ও আমার গলা টিপে ধরলো। তারপর জ্ঞান হ'য়ে দেখি আমি হাসপাতালে। শুনলাম যতীন্দ্রবিমল বোধ হয় বেঁচে যাবে। আর কথা বলতে পারছি না, কষ্ট হচ্ছে। খোকন রইলো। তার সমস্ত দায়িত্ব সতীশবাবুকে দিয়ে গেলাম; মা আর বাবার স্নেহ এক সঙ্গেই সে পাবে নিশ্চয়ই তার কাছে। আমি জানি আমার মৃত্যু আপনার জীবনের এক চরম আঘাত। আর বলতে পারছি না।

বিদায়—মঞ্জু।

—না না মঞ্জু মরতে পারে না সতীশ।

ঝড়ের মতো এলো খোকন।

সে বলে—কে মরেছে মামাবাবু? মায়ের কথা বলছিলেন কেন?

আমায় নিরুত্তর দেখে সে ছুটে যায় সতীশের কাছে।

—মায়ের কি হয়েছে কাকাবাবু?

সতীশ তার বুকের উপর খোকনকে জড়িয়ে ধরে বলে—তোমার মা মারা গেছে খোকন।

—মা, মা মারা গেছে কাকাবাবু! কাকাবাবু!

উন্মাদ খোকনকে আরো চেপে ধরে সতীশ বুকের মধ্যে।

১৪

ফাল্গুনের সকাল। সারা শোকাচ্ছন্ন রাত্রির কালিমা মুছে বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছি। নতুন সূর্য্যের সোনালী রং গাছে পালায় ঝিক্‌মিক করছে। গাছে গাছে এসেছে নতুনের সমারোহ। ওদের সমস্ত দুঃখ দৈন্য ঝরা-পাতার সঙ্গে দূর হ'য়ে গেছে। আজ যেন ওরা নবীন। সমস্ত পৃথিবী যেন বলছে – দুঃখ নেই, শোক নেই, ব্যর্থতা নেই। সমস্ত মুছে দিয়ে আজ আমি নতুন রূপে এসেছি। চেয়ে দেখ পূবে, পশ্চিমে, উত্তরে আর দক্ষিণে প্রভাত সূর্য্যের লালিমা। যুগ যুগ ধরে বঞ্চনার হতেছে শেষ। ব্যর্থতার পাষাণ রাত্রি শেষে নবজীবনের সূর্য্যোদয়।

কিন্তু আমি তো দেখছি ব্যর্থ, ব্যর্থ সব! আমার জীবনের মাপকাঠিতে বিচার করি পৃথিবীর। মনে পড়ে লীলার কথা, মীরার কথা। মনুর মৃত্যুও আমার জীবনের চরম আঘাত। লীলাকে ভাল বেসেছিলাম। সমাজের বৈষম্য আমাদের মিলন পথে টেনে দিয়েছিল সীমারেখা। তার প্রতিবাদে সে বৈষম্যকে আঘাত দিতে চেষ্টা করিনি, শুধু নিষ্ফল প্রায়শ্চিত্য করতে চেষ্টা করেছি। কিন্তু লীলা

সুখী হয়েছিল কি ? হয়তো চেষ্টা করেছিল কিন্তু বাধা দিল অর্থ-নৈতিক বৈষম্য। মীরা ! মীরার জীবনকে সুন্দর করে তুলতে পারতাম। কিন্তু পারিনি। নৈতিক বোধের ভুয়ো শিখরে উঠতে চেষ্টা করেছি, পায়ের তলার বাস্তব মাটি যে ক্রমশঃ ক্ষয়ে যাচ্ছিল তার দিকে ফিরে তাকাইনি। জীবনের অতৃপ্ত ভালবাসা স্নেহের খাদে রূপ নিল জীবনের প্রান্ত সীমায় মঞ্জুর ভ্রাতৃত্বে। কিন্তু সেখানেও এলো ব্যর্থতা। খগেনবাবু সার্থক করতে পারল না মঞ্জুকে। সতীশের মাঝেই হয়তো মঞ্জু খুঁজে পেয়েছিল সার্থক পথের ইঙ্গিত কিন্তু নৈতিক নামাবলী গায়েজড়ানো স্থবির সমাজে সে পথের সার্থক রূপ এখনও ফুটে ওঠেনি। সতীশ এ সমাজেরই তো একজন। সে সৎ, চরিত্রবান সব কিছু গুণেরই অধিকারী কিন্তু ব্যর্থতাকে মুছেদিয়ে নতুনের সৃজনেয় শক্তি কৈ তার ? বিদ্রোহী জীবন তো বাঁধাধরা নিয়মে চলে না। মঞ্জু নিঃশেষ হলো জীর্ণ সমাজের বাঁধাধরা গণ্ডিরই সীমা রেখায়।

কিন্তু সীমা ? কাল বিকালে সে খোকনকে নিয়ে চন্দ্রনাথ কুটীরে চলে গেছে। রাত্রে চন্দ্রনাথ এসেছিলো। শুনলাম তারা আজ কোলকাতা চলে যাবে। সামনের বোশেখেই অশোকের সঙ্গে সীমার বিয়ে দেবার মনস্থ করেছে চন্দ্রনাথ। সতীশের পাশে দাঁড়াতে সীমার আজ দ্বিধা কেন ? হয়তো সে পিতার আভিযাত্যের গর্ব্বকে ধুলিস্যাৎ করতে অনিচ্ছুক। আভিযাত্যের যুপকাষ্ঠে সেও কি হবে বলি ? মনে এলো রেখাকে। সংগ্রামী জীবনের মাঝে সমাজের

আঘাতকে তুচ্ছ করে সে এক নতুন জীবনের সাধনা করছে; পারবে কি?

কুটন্ত চন্দ্রমল্লিকার পাশে দেখতে পাই মালতী আর কার্ত্তিককে। দুজনে জল দিচ্ছে গাছের গোড়ায়। কার্ত্তিক চন্দ্রমল্লিকার গুচ্ছ পরিয়ে দিল মালতীর খোঁপায়। ওরা হাসে; ওদের হাসিতে ঝরে নবজীবনের ঝর্ণাধারা। ওরা দুজনে খাটে, দুজনে গড়ে, বৈষম্য নেই বাধা নেই। ওরা মুক্ত, স্বাধীন, স্বচ্ছ—ওরা বাস্তব। ওদের দেখে আশা জাগে। মনে হয় রোমান্স আর বাস্তব এক হ'য়ে উঠেছে এক নুতন জীবন—বেদের সৃজনে! যেখানে রোমান্সে থাকবে না কৃত্রিমতা আর বাস্তবে থাকবে না গোঁড়ামি। ওপরের আকাশ নীচের ধূসর মাটির বুকে ঐ যে যেখানে এঁকেছে সবুজ রেখা—মানুষের স্বর্গ কি হবে রচনা সেথায়!

ওকি, ওরা কারা আসে! সত্যেন আর ওর পাশে রেখা। দুজনে যেন উজ্জ্বলতায় ফেটে পড়ছে। রেখা আমায় দেখতে পেয়েছে; সে আপন ভোলা সত্যেনকে কি বললো। ওরা দুজনে চেয়ে দেখে আমার দিকে। উদয়নের প্রাঙ্গনের মধ্যে কার্ত্তিক আর মালতী ওদের অভ্যর্থনা জানায়; ওরা ওপরে উঠে আসছে। সতীশ এসে দাঁড়াল দ্বারের পাশে।

—এসো এসো সত্যেন, এসো রেখা।

রেখা আর সত্যেন আমায় প্রণাম করে। একি রেখার সিঁথিতে সিঁদুরের সমারোহ!

আমার বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে সত্যেন বলে—আপনার বোনকে মর্য্যাদা দেবার কথা বলেছিলেন একদিন। তাকে মর্য্যাদা দিয়েছি বড়দা।

রেখা বলে—ওখান হ'তে চলে যেয়ে আবার সুরু করেছিলাম সংগ্রামের জীবন। একদিন এক নোংরা গলিতে আবার আপনার ভাই এর সঙ্গে দেখা। উনি বললেন, ফিরে চলো রেখা। বললাম, পাথেয় কৈ, মর্য্যাদাই বা কোথায় আমার? উনি বললেন, পাথেয় আর মর্য্যাদা সবই দেব আমি। বড়দা আপনার বোনেরা ব্যর্থ হয় নি।

হাতে তখনও ছিল মঞ্জুর শেষ চিঠি। ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে ফেললাম।

সত্যেন জিজ্ঞাসা করে—কি ছিঁড়লেন বড়দা?

—এক ছেঁড়া চিঠির শেষ অধ্যায়।

সত্যেন বলে—ঐ অধ্যায়ের মধ্যে যে লুকিয়ে রইলো আমাদের বহু পাথেয় বড়দা। বহু দুঃখ বহু সংগ্রামের মধ্য দিয়েই আসে ঐ নতুন পৃথিবী। মঞ্জু বৌদির মতো বহু হতভাগিনীর আত্মদান তার পথকে মসৃণ করে। তাইতো ওরা ব্যর্থ নয়। রামনগর গিয়েছিলাম, সব শুনেছি। খোকন কৈ?

সীমা খোকনের হাত ধরে কখন এসে দাঁড়িয়েছে সতীশের পাশে, দেখিনি।

খোকনকে আরো টেনে নিয়ে সে বলে ওঠে—মঞ্জুদি সতীশবাবুর উপর খোকনের মা ও বাবার দায়িত্ব দিয়ে গেছে।

সতীবাবুকে সাহায্য করবার জন্য খোকনের মায়ের দায়িত্ব আমি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করেছি সত্যেনবাবু।

বিস্মিত দৃষ্টিতে সীমার দিকে চেয়ে রইলাম।

সীমা বলে —আপনার বোনেরা কেউ ব্যর্থ হয়নি বড়দা।

না, না কেউ ব্যর্থ হবে না। লীলা হয়নি, মীরা হয়নি, মঞ্জু হয়নি, সীমা, রেখা কেহ হবে না। পৃথিবীর ব্যর্থতার ইতিহাসের পাতা মুছে লেখা সুরু হয়েছে সার্থক নব জীবনের ইতিহাস। সে লেখা আরো উজ্জ্বল হ'য়ে উঠবে সংগ্রামী মানুষের রক্তরেখায়।

শেষ